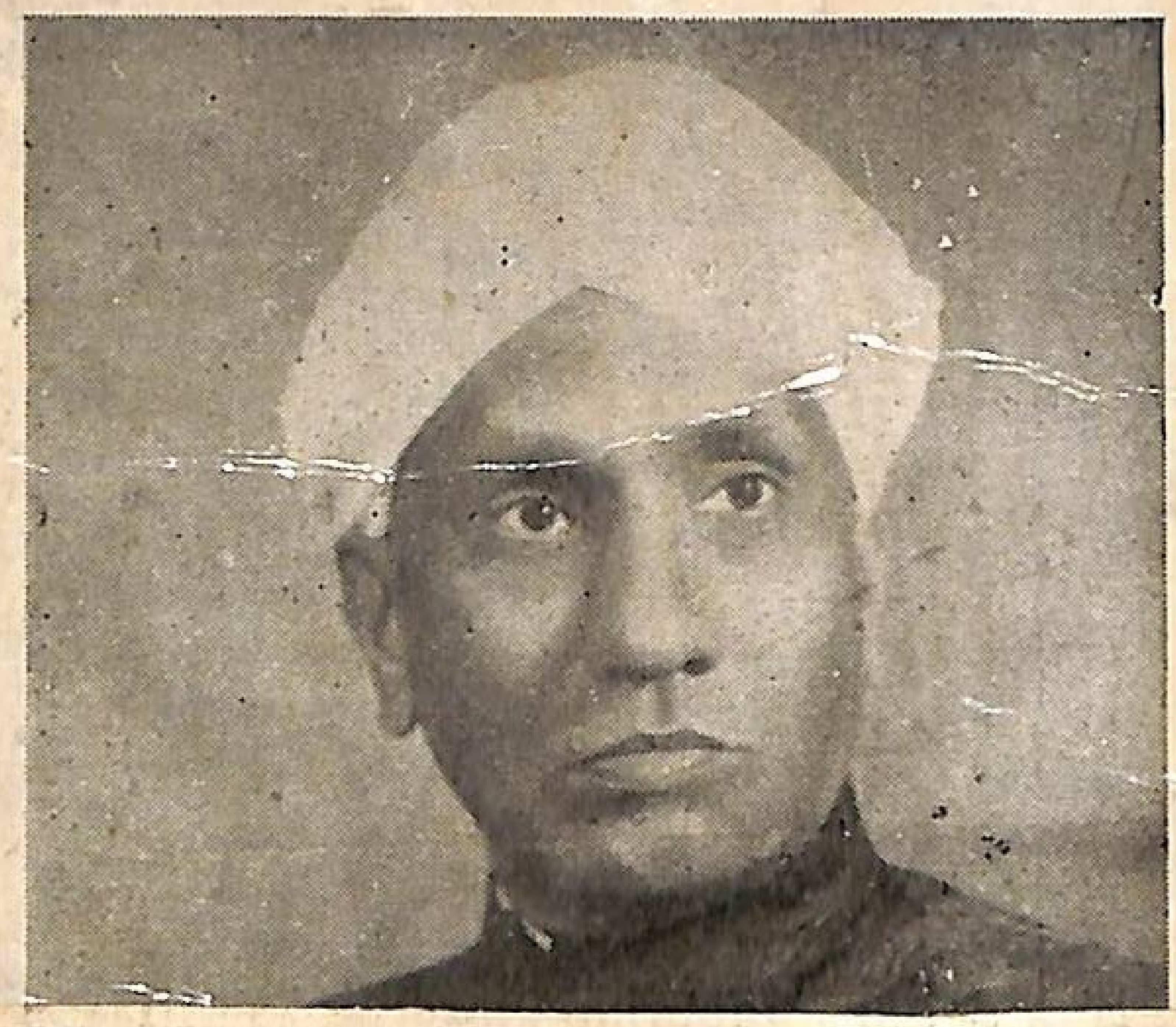


মণি বাগচি

কৃতী বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন

ভারতের বিজ্ঞানসাধক

কৃতী বিজ্ঞানী

সি. ভি. রমন

মণি বাগচি

দিবাকর সেন কর্তৃক
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত

শৈব্যা • প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

প্রকাশক :
রবীন বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮২
দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ— জুন ১৯৮৭

প্রচ্ছদ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দাম : দশ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅশোক চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

জীবনচরিত রচনার সূত্রে গ্রন্থকারকে লিখিত স্যর রমনের পত্র

Raman Research Institute
Hebbal Post, Bangalore-6
18th June, 1965.

Sri C. V. Raman, F.R.S., N. L.,
Director

Ref : No. 188
Mr. Moni Bagchee,
Author & Journalist,
90, Baguiati Road,
Dum Dum,
Calcutta-28
Dear Sir,

I have just recieved your kind letter of the 15th instant.

A book of the sort mentioned by you, in my opinion, should not deal with anyone who is still living. So far as I am personally concerned, I am wholly averse to my name appearing in a publication of the kind contemplated in your letter. I would therefore, firmly request you to leave my name out of your publication.

Yours truly,
C. V. Raman (s/d)

ভূমিকা

ভারতের বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন একটি বিস্ময়কর প্রতিভা। আলোকবিজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞানে তাঁর অতুলনীয় অবদানের ফলে বিজ্ঞানজগতে আমাদের দেশ এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। যদিও তাঁর পরিচয় একজন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীরূপে, তথাপি জ্ঞানের বিচিত্র পথে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। রমন বলতেন, 'অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া তথ্যই বিজ্ঞান নয়। এসব তথ্যের সঠিক রূপ কি, এদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে কিনা, আর যদি থাকে তা কি, অথবা এদের মধ্যে মূলকথা কি—এসব জানার চেষ্টা থেকেই তো বিজ্ঞানের উদ্ভব। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্ম পরীক্ষাগারে আর তত্ত্বগত বিজ্ঞানের জন্ম গণিতের সূতিকাগারে। এই দুইয়ে মিলিয়েই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।'

আচার্য রমনের বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা। তিনি যেদিন পদার্থবিজ্ঞানে দুর্লভ নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন সেদিন তাঁর স্বদেশবাসী যে গৌরববোধ করেছিল সেই ইতিহাস ভুলবার নয়। এই বইতে সেই বিজ্ঞানীর বিচিত্র জীবনকথা ও তাঁর আবিষ্কারের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হলো। বড়ো হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানবে।

মণি বাগচি

৯০ বাগুইআটি রোড, কল-২৮

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

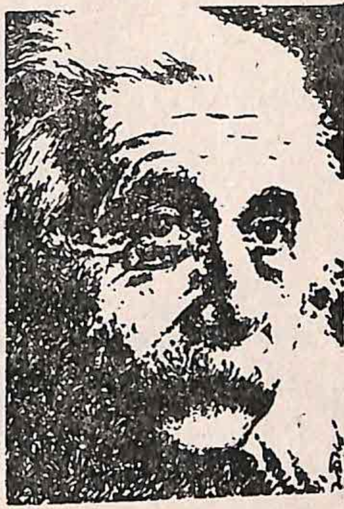
মূল গ্রন্থটির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গ্রন্থটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করা হলো। আশা করি সংস্করণটি কিশোর পাঠকসমাজে আদৃত হবে।

দিবাকর সেন

তত্ত্বাবধায়ক : জগদীশ বসু যন্ত্রাগার

বসু বিজ্ঞান মন্দির

৯৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলকাতা-৯



'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্যর সি. ভি. রমন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞান-জগতে নিউটন, ডারুইন, স্যর জে. সি. বোস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের স্থান যে শ্রেণীতে, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক রমনের স্থানও সেই শ্রেণীতে। তাঁর আবিষ্ক্রিয়া, 'রমন এফেক্ট' বিজ্ঞানে ভারতের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর এই আবিষ্কার আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

—আলবার্ট আইনস্টাইন
(1953)

লেখকের অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ

জীবনী শতক

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

কৃতীবিজ্ঞানী ড. ভাবা

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

আচার্য জগদীশচন্দ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

॥ এক॥

২১০নম্বর বৌবাজার স্ট্রিট[১] কলকাতা শহরের একটা খুব কর্মব্যস্ত অঞ্চল। এইখানে ১৮৭৬ সালে বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির নাম, 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স'[২]। এটি স্থাপন করেছিলেন তখনকার দিনের নামকরা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সত্যিই চিরস্মরণীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যদিও ১৮২৩ সালে বিদ্যালয় শিক্ষাসূচী সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন, "সরকার দেশে বিদ্যা বিস্তার কল্পে যে অর্থব্যয় করিবেন তাহা গণিত, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে ব্যয়িত হইলে উপকার হইবে এবং সেইজন্য আবশ্যক পুস্তক ও যন্ত্রাদি সম্বলিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে য়ুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় লোকের দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক।" রাজা রামমোহনের এই উক্তির বেশ কিছু বছর পরে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও বিদেশী শাসকরা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন নি। তবে রামমোহনের সুচিন্তিত চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিলেন সেকালের বহু বিখ্যাত মানুষ। এদের মধ্যে ডাঃ

১। এখনকার নাম বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট।

২। এই সংস্থাটি বর্তমানে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। তিনি ১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে "ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীকে বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত হতে আহ্বান করেন। তাঁর এই প্রবন্ধের বক্তব্য দেশীয় শিক্ষিত সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করে। দেশবাসীর আগ্রহ লক্ষ্য করে ডাঃ সরকার বাংলা ভাষায় লিখিত একটি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করে তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন॥ এই পত্রে তিনি বলেছিলেন,

বিশ্ব-রাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থির চিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয় এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মে। যাহার দ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয় তাহাকেই বিজ্ঞান শাস্ত্র বলা হয়।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চা ছিল। তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান-কালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক উন্নতহইয়াছেতাহাদের মধ্যে অনেকগুলির প্রথম বীজ রোপণ প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ শাখা সকল বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে, কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।...

ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে উৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহা রক্ষা করা সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক

পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তির বিশেষ আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্মাণ করা, বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুশীলনে একান্ত অভিলাষী আছেন, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চার জন্য আহ্বান করা হইবে।

এই সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক। অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীত-ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাতত যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে কিম্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।”

এই অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজ মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিল, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যেন টাকা পয়সার জন্যই অপেক্ষা না করেন। তাঁর সভা আপাতত প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যেই শুরু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহেন্দ্র লাল তা মেনে নেন নি। এরপর আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়ালেন দেশের সাধারণ মানুষ, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ ও অনেক বিত্তশালী মানুষ। ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হল আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান চর্চার আদি প্রতিষ্ঠান। ডাক্তার সরকার তাঁর দূরদর্শিতা বলে বুঝেছিলেন বিজ্ঞানচর্চা ভিন্ন দেশের উন্নতি নেই।

১৯০৮। মার্চ মাস। একদিন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছিলেন এক মাদ্রাজী যুবক। বয়স কম, কিন্তু চাকরি করতেন খুবই বড়ো—বাংলা প্রদেশের ডেপুটি একাউন্টান্ট

জেনারেল ছিলেন তিনি তখন। এক বছর হলো চাকরিতে ঢুকেছেন। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সেই মাদ্রাজী যুবকটি একটি সাইনবোর্ড লক্ষ্য করলেন। লেখা রয়েছে: The Indian Association for the Cultivation of Science ;

যুবকটি কাজ করেন ভারত সরকারের অর্থবিভাগে। দায়িত্বপূর্ণ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। তথাপি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত দুশো দশ নম্বর বাড়িটির প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করলেন তিনি এবং তখনি সেই বাড়িটির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডাক্তার অমৃতলাল সরকারের পরিচয় হলো।

—কী নাম আপনার ?

—সি. ভি. রমন—চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন।

—কি করেন আপনি ?

—এই প্রদেশের আমি ডি. এ. জি.—ডেপুটি একাউন্টান্ট জেনারেল।

—এখানে আপনার কী দরকার ?

—আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আমি একজন গবেষক। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানে যদি গবেষণা করার সুযোগ পাই তাহলে খুব ভাল হয়।

সম্পাদক যুবকের কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন ইনি একজন সত্যিকারের উৎসাহী গবেষক। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন গবেষণা করার জন্য। কলকাতায় এসে অবধি এই রকম একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের তিনি খোঁজ করছিলেন। চাকরিটা ছিল তাঁর কাছে নিছক গৌণ ব্যাপার—জীবিকা অর্জনের উপায় স্বরূপ, তাঁর সমস্ত মন আর চিন্তা নিবদ্ধ ছিল গবেষণার দিকে। আজ অপ্রত্যাশিতভাবে তারই সুযোগ পেয়ে যুবকটি যেন কৃতার্থ হলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া রমনের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা, একথা তিনি নিজেই বলেছেন। অমৃতলাল ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকারের ছেলে।

১৮৮৮, ৭ নভেম্বর।

দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লীতে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন জন্মগ্রহণ করেন।

ঐ একই বছরে ঠিক ছুমাস আগে দক্ষিণ ভারতের অন্য এক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর একটি ভারতরত্ন। তিনি সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণান—যিনি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। রাধা-কৃষ্ণান ও রমন ছুজনেই বিশ্বের দরবারে তাঁদের জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন নিজের নিজের প্রতিভাবলে। একজন দর্শনে, অন্যজন বিজ্ঞানে। এক অতি সাধারণ পরিবারে চন্দ্রশেখরের জন্ম হয়। তাঁর বাবা চন্দ্রশেখর আয়ার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমাদের দেশে পারিবারিক জীবনে অনেক কাল থেকেই একটা বিশ্বাস চলে আসছে যে বেশির ভাগ সংসারে পিতামাতাদের ইচ্ছা তাঁরা যেন পুত্রসন্তান লাভ করেন। শুধু পুত্র কামনা নয়, সেই ছেলে বড়ো হয়ে কৃতী হবে, পিতামাতার গুণকে ছাড়িয়ে খুব গুণবান হবে এবং পরিবারে নেমে আসবে আনন্দ ও গৌরব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, ১৮৮৮ সালে মাদ্রাজে আর একটি প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। তিনি শ্রীনিবাস রামানুজম (১৮৮৮-১৯২০)। গণিতশাস্ত্রের একটি বিস্ময়কর প্রতিভা হিসাবে ইনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (Fellow) নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফুরণ হবার আগে বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

রমনের জন্মকালে তাঁর পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার আর মা পার্বতী আম্মল, ছুজনের মনের মধ্যে ঠিক এই রকম আশা জেগে থাকবে। তাঁদের খুব সৌভাগ্য হয়েছিল যে তাঁদের এই আশা বহুল পরিমাণে চরিতার্থ হয়েছিল। এখন স্বাধীন ভারতের যে অঙ্গ রাজ্যটির নাম তামিলনাড়ু আগে এর নাম ছিল মাদ্রাজ। মাদ্রাজের ছুটি সাধারণ কিন্তু সুপরিচিত পরিবার থেকেই এসেছিলেন রমনের মা ও বাবা।

পুত্রের জন্মের সময় চন্দ্রশেখরের ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। তিনি বি. এ. পড়বার সময়েই শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন। তাইতো রমন যখন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, তখন একজন বিদেশী সংবাদদাতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁকে বলেছিলেন, আপনার তো খুব বড়লোকের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল এবং আপনার শৈশবজীবনের পরিবেশটা বেশ নিরুদ্বিগ্ন হওয়া দরকার ছিল আপনার বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণের জন্য।

এর উত্তরে আচার্য রমন হেসে বলেছিলেন, 'আমি তামার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছিলাম। আমার জন্মকালে আমার বাবার দশ টাকার বিরাট মাসিক আয় ছিল। রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন সেই বিদেশী সাংবাদিক এই কথা শুনে। ভারতের সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক একটি সামান্য পরিবারে তাঁর জন্মের কথা বলতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করলেন না—অম্লান বদনে বললেন, তাঁর জন্মকালে তাঁর বাবার মাইনে ছিল দশ টাকা—এই মনোভাবই তাঁকে বিস্মিত করেছিল। ভারতের এক মহান সন্তানের জন্ম এই রকম সামান্যভাবে হয়েছিল, একথা শুনলে কেই বা না বিস্মিত হবে!

চন্দ্রশেখর আয়ার দরিদ্র হলেও প্রতিভাবান ছিলেন এবং অনেক বিষয়েই তাঁর যোগ্যতা ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষরা চাষবাস করতেন। চন্দ্রশেখরই এই পরিবারের প্রথম সন্তান যিনি তাঁর পারিবারিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেন ও স্থানীয় একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর সময় থেকে এই পরিবারের আর কাউকে লাঙল ধরতে হয়নি। তবে পারিবারিক একটি ঐতিহ্য তিনি বজায় রেখেছিলেন। সেটি হলো সংগীতের প্রতি অনুরাগ। তিনি বীণা ও বেহালা বাজাতে পারতেন। রমনের জন্মের কিছু পরেই চন্দ্রশেখর পূর্বভারতের কাছাকাছি ভিজাখাপত্তমে[১] একটি কলেজে অধ্যাপকের চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যার

১। এখনকার নাম বিশাখাপত্তনম্।

অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞানের এই শাখা ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর অধিকার ছিল। পিতার এই বহুমুখী অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগ পুত্র রমনকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল।

রমনের মা যে পরিবার থেকে এসেছিলেন সেই পরিবার সংস্কৃত-চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে পার্বতী আম্মলের বাবা পায়ে হেঁটে নবদ্বীপ এসেছিলেন। নবদ্বীপ তখন সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল। সেখানে কিছুকাল বাস করে, সেখানকার এক বিখ্যাত পণ্ডিতের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং আবার পায়ে হেঁটেই দেশে ফিরে আসেন। তখনকার দিনে দক্ষিণ-ভারত থেকে পূর্ব-ভারতের এক প্রান্তে এইভাবে পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা কম শ্রমসাধ্য ছিল না। তাঁর বাবার কাছ থেকে কন্যা পার্বতী সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ লাভ করেছিলেন। সাধারণভাবে শিক্ষিতা না হলেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্পর্কে পার্বতী আম্মলের মোটামুটি ধারণা ছিল বলা চলে। সংস্কৃতের প্রতি মায়ের এই অনুরাগ তাঁর বিজ্ঞানী পুত্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে তাঁর পিতৃ-বংশ ও মাতৃ-বংশের মধ্যে যা কিছু ভালো তার সবটুকু রমন লাভ করেছিলেন। তাঁর বাল্য ও শৈশবের পরিবেশ প্রাচুর্যমণ্ডিত না হলেও তা সংস্কৃতি-মণ্ডিত ছিল। পারিবারিক প্রভাব ছাড়া বালক রমনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ আর গান-বাজনায় আগ্রহ।

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। পারিবারিক পরিবেশ রমনকে বিজ্ঞানের দিকে টেনে আনলেও ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এদেশে এসেছিলেন একজন বিদুষী আইরিশ মহিলা। তাঁর নাম এ্যানি বেশান্ত। তাঁর বক্তৃতা রমনকে ধর্ম ও সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত করেছিল। এ্যানি বেশান্তের প্রভাব যুবক রমনের মনকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল যে, তিনি কিছুকাল ধর্মসাহিত্য পাঠে মন দিয়েছিলেন। তিনি যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন রামায়ণ

ও মহাভারত—এই দুটি মহাকাব্য সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটি তাঁর অধ্যাপকদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল। বিজ্ঞানী রমনের ধর্মসাহিত্য চর্চা তাঁর জ্ঞান পিপাসু মনের পরিচয় বহন করে।

তাঁর বাবা যখন কলেজে লেকচারারেরচাকরিনিয়েভিজাখাপত্তমে এলেন তখন রমনের বয়স ছিল চার বছর। সমুদ্রের ধারে এই মনোরম স্থানে নতুন করে সংসার পাতলেন চন্দ্রশেখর। তিনটি প্রাণীর সংসার—স্বামী, স্ত্রী ও চার বছরের শিশুপুত্র। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষায় কথা বলত। রমনেরজীবনের পরবর্তী দশ বছর এইখানেই অতিবাহিত হয়েছিল। এখানকার একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে তিনি আট বছর পড়েছিলেন আর স্থানীয় কলেজে দু' বছর। এর ফলে সংস্কৃত ও মাতৃভাষা তামিল ব্যতীত রমন তেলেগু ভাষা খুব ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। এই তিনটি ভারতীয় ভাষা ছাড়া সেই বয়সে তিনি ইংরেজি ভাষাতে খুব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি যে ইংরেজি খুব ভালো শিখেছিলেন সেটা অনেকের জানা ছিল না। একবার একজন সরকারী পরিদর্শক স্কুলে এসেছেন। ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজিতে কে কেমন দক্ষতা অর্জন করেছে সেটা তিনি পরীক্ষা করলেন। রমন তখন যে ক্লাসের ছাত্র ছিলেন সেই ক্লাসের ছাত্রদের ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছিল। রমনের প্রবন্ধটি পরীক্ষা করে ইন্সপেক্টর সেটিকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন।

যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে রমন কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯০২ সালে তিনি যখন ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা পাশ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে—সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনিই অধিকার করেছিলেন প্রথম স্থান। ছাত্রজীবনেই রমনের প্রতিভা বিকশিত হতে আরম্ভ করেছিল। তিনি যখন কলেজে ভর্তি হন তখন বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে ইতিহাস নিয়ে পড়তে বলেছিলেন। তাতে চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সুবিধা হতো। এমন কি সরকারী

উচ্চপদ লাভও সহজ হতে পারতো। রমন কিন্তু উঁচুপদের জন্য লালায়িত ছিলেন না। সরকারী চাকরির আকর্ষণ থেকে তাঁর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল বিজ্ঞানের হাতছানি। কাজেই ইতিহাস পড়া হলো না।

১৯০৩। জানুয়ারি মাস।

রমন মাদ্রাজে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। তখন তাঁর বয়স পনের বছর। একদিন তিনি ভুল করে ইংরেজি ক্লাসে ঢুকে পড়েছেন। ইংরেজির অধ্যাপক যিনি তখন ক্লাস নিচ্ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি এই ক্লাসের ছাত্র ? ভীরু ছাত্রটি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, স্যর। আসল কথা তিনি ভুলে ঐ ক্লাসে ঢুকে পড়েছিলেন সেদিন। মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতি রমন নিজে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

'মাদ্রাজে যে চার বছর আমি কলেজে পড়েছিলাম সেই সময়ে আমি ইংরেজ অধ্যাপকদের কাছ থেকে (এঁরা সকলেই বিভাগীয় প্রধান ছিলেন) সহৃদয়তাপূর্ণ যে ব্যবহার পেয়েছিলাম তা আমি কোন দিনই ভুলিনি। প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে তাঁরা মনোযোগী ছিলেন। প্রতিটি ছাত্রের জন্য তাঁরা সমান আগ্রহ দেখাতেন। তখনকার কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আমার যে ছবি আছে তা দেখলে পরে বোঝা যাবে আমি আকৃতিতে দেখতে যেমন ছোট ছিলাম, পরিচ্ছদের মধ্যেও তেমন কোন চাকচিক্য ছিল না। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, মাথায় একটা উলের টুপি—এই বেশে আমাকে কলেজের ছাত্র বলে মনে করা কঠিন ছিল। অধ্যাপকরা প্রথম প্রথম মনে করতেন আমি বুঝি একজন স্কুলের ছাত্র—ভুল করে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে মিশে গেছি। ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক ই. এইচ এলিয়ট একদিন তো আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি সত্যিই বি. এ. ক্লাসের ছাত্র কিনা। উত্তরে আমি যখন বললাম, হ্যাঁ, তখন তিনি বিশ্বাস করতে না পেরে আমার বয়স জিজ্ঞাসা করেছিলেন।'

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই রমনের প্রতিভার বিকাশ দেখা গেল। পরীক্ষার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যা এতদিন আবদ্ধ ছিল, উন্মুক্ত পরিবেশে তা এইবার ফুটে উঠতে লাগলো। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করলেন। এছাড়া পদার্থ-বিজ্ঞানে কৃতিত্বের জন্য পেলেন একটি সোনার মেডেল। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সহজাত। তাঁর স্কুল জীবন থেকেই এর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে। স্কুলে পড়বার সময়েই তিনি ভাঙ্গচোড়া জিনিস দিয়ে বাড়িতে একটা ডাইনামো তৈরি করেছিলেন। তাই দেখে অনেকে বলেছিলেন, এ ছেলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন নিউটন হবে। তাঁর বয়সের অনুপাতে বিজ্ঞানের অনেক বড় বড় বই পড়তেন আর নিজের তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে বাড়িতে Experiment করতেন। একবার যখন তিনি অসুখে শয্যাগত ছিলেন তখন তাঁর বাবাকে রমন বলেছিলেন, আমাকে লিডেন জারের (Leyden Jar) প্রক্রিয়াটা একটু দেখাবার ব্যবস্থা করে দিন, এটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

তিনি যখন কলেজের ছাত্র তখন থেকেই রমনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছিল এবং শব্দ ও আলোকতরঙ্গ সম্বন্ধে অনুশীলন করতে থাকেন। আধুনিক ভারতবর্ষে তখনকার দিনে গবেষণা জিনিসটা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল, একথা তোমরা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনীতে পড়েছ। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি যখন স্নাতক হননি, তখনই রমনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শুধু যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল তা নয়, তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় নাম-করা আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। তাঁর বয়স কুড়ি বছর পূর্ণ হবার আগেই গবেষণার ব্যাপারে রমন যেমন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন ও এই বিষয়ে তখন থেকেই তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দিতে থাকে।

প্রতিভার নিয়মই এই। যার মধ্যে সত্যিকার প্রতিভা থাকে

তার স্ফুরণ হবেই—কারো ক্ষেত্রে সেটা বিলম্বে ঘটে, আবার কারো ক্ষেত্রে সেটা অনেক আগে থেকেই হয়ে থাকে, যেমন হয়েছিল বিজ্ঞান সাধক রমনের জীবনে। বি. এ. পরীক্ষার কিছুদিন পরের কথা। একদিন তাঁর সহপাঠী আপ্পারাও বন্ধুর কাছে এলেন কয়েকটি কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে। রমনের অনুসন্ধিৎসু মন সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। কিন্তু দুই বন্ধু অনেক চেষ্টা করেও সমস্যাটির সঠিক সমাধানে ব্যর্থ হলেন। তখন দুজনে গেলেন অধ্যাপক জোন্‌সের কাছে। অধ্যাপক জোন্‌স-ও সেই সমস্যাগুলি নিয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। রমন অবশ্য পরাজিত হতে রাজী ছিলেন না। নিজের বুদ্ধিবলেই দুরূহ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান হলো।

রমনের এই প্রচেষ্টার ফলে পদার্থবিদ্যার এক কঠিন সমস্যা সেদিন সহজতর হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের শব্দ সম্পর্কিত মতবাদ (Theory) ছাত্রদের পড়বার সুবিধা হয়। লর্ড র‍্যালে স্বয়ং রমনকে তাঁর এই কাজের জন্য অভিনন্দিত করলেন। এই গবেষণার ফল একটি প্রবন্ধাকারে লিখে রমন পাঠিয়ে দিলেন ওদেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ। সেই পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর হয়নি। এই সময়ে তাঁর আরো কিছু মৌলিক প্রবন্ধ লণ্ডনের 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কারো সুপারিশ ছাড়াই তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ছাত্রজীবনেই রমন উৎসাহী গবেষকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বিদেশেও তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রশংসিত হয়েছিল। এসবই ছিল রমন প্রতিভার প্রাথমিক স্ফুরণের দৃষ্টান্ত।

॥ দুই ॥

বিজ্ঞানী রমনের জীবন কখনো এক খাতে প্রবাহিত হয়নি।

তাঁর মন ছিল যেমন বৈচিত্র্য-পিয়াসী, তেমনি বৈচিত্র্যও হয়েছিল তাঁর সহযোগী। তাই বারবার তাঁর কর্মধারা পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯০৭ সালে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছেলেকে তিনি ইংলণ্ড পাঠাবেন, যদিও এজন্য তাঁর সঙ্গতি সামান্যই ছিল। মায়েরও ইচ্ছা ছেলে বিলাত যায়। শেষ পর্যন্ত যখন সরকারী ব্যবস্থায় তাঁর বিলাত যাওয়া ঠিক হয় তখন রমনের দুর্বল স্বাস্থ্য বিলাত যাওয়ার বাধা হয়ে দাঁড়ালো। যখন শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে সরকারী ডাক্তারের কাছে পাঠানো হলো, তিনি অভিমত দিলেন : 'এর স্বাস্থ্য খুব দুর্বল, শরীর কৃশ ; এমন অবস্থায় একে বিলাত যাওয়ার জন্য আমি সুপারিশ করতে পারিনে।'

বিলাত যাওয়া হলো না।

সকলের মন খারাপ হলো। তখন হিতাকাঙ্ক্ষীরা রমনকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে পরামর্শ দিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন সুযোগ ছিল না, তাই যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতেন তাঁদের অনেকেই ভারত সরকারের উচ্চপদের চাকরির জন্য প্রতি-

যোগিতামূলক পরীক্ষা দিতেন। এই জাতীয় সর্বভারতীয় পরীক্ষার মধ্যে দুটি ছিল প্রধান ও সম্মানজনক। তার একটি ছিল সিভিল সার্ভিস। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারা যেত আর অন্যটি ছিল ফাইনান্স সার্ভিস। প্রথমটির জন্য বিলাত যেতে হতো; কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষাটি এদেশেই গৃহীত হতো। এটি ছিল সর্বভারতীয় পরীক্ষা। তখন এই পরীক্ষা কলকাতায় গৃহীত হতো। কলকাতা ছিল তখন ভারতের রাজধানী। কিন্তু এই সর্বভারতীয় পরীক্ষায় নির্বাচিত হওয়া কঠিন ছিল। অধ্যাপক জেমসের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন রমন। তাঁরই সুপারিশে এবং চেষ্টায় রমন ভারত সরকারের অর্থবিভাগের সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিতে পেরেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এম. এ. পরীক্ষা দেবার সময়েই লোকসুন্দরী আম্মলের সঙ্গে রমনের বিয়ে হয়। শ্রীমতী লোকসুন্দরী রমন তাঁর প্রতিভাবান স্বামীর যোগ্য জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। কেতাবী শিক্ষা না থাকলেও তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল প্রখর। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া আরো কয়েকটি ভাষার ওপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল। সংগীত ও চারুশিল্পকলার প্রতি অনুরাগ এবং ভারতীয় নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁকে সর্বতোভাবেই রমনের যোগ্য স্ত্রী করে তুলেছিল। তাঁর স্বামী যে সাধারণ স্তরের মানুষ নন, এটা বিয়ের অল্পকাল পরেই লোকসুন্দরী বুঝতে পেরেছিলেন। 'আমার প্রতিভার বিকাশে আমার সহধর্মিণীর সেবা ও সাহচর্য কম সহায়ক ছিল না।'—এই কথা বলেছেন আচার্য রমন।

১৯০৭। ফেব্রুয়ারি মাস।

বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

তিনি কলকাতায় এসে অর্থবিভাগের সর্বভারতীয় পরীক্ষা (Indian Finance Service) দিলেন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি প্রথম হলেন এবং জুন মাসে ঐ বিভাগে সহকারীপ্রধান হিসাব পরীক্ষকের (Assistant Accountant General) পদের জন্য

মনোনীত হলেন। একবছর পরে তিনি ডেপুটি এ্যাকাউন্টান্ট-জেনারেল পদে উন্নীত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। জীবনের পরবর্তী দশটি বছর অর্থ দপ্তরের এই দায়িত্বশীল পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এটা শুনতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে, যিনি তাঁর ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের অনুশীলনে তৎপর ছিলেন, বিজ্ঞানলক্ষ্মীর আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করার সংকল্প করেছিলেন যিনি, সেই রমনকে দশটি বছর সরকারী দপ্তরে চাকরি করতে হয়েছিল। এর থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, সে সময়ে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের গবেষণার কোনরকম সুযোগই ছিল না। আর তা ছিল না বলেই প্রতিভাবান যুবকরা তখন সরকারী চাকরির প্রতি আকৃষ্ট হতেন। এ ছাড়া তাঁদের সামনে আর তো কোন পথ খোলা ছিল না। এই প্রসঙ্গে রমন নিজেই বলেছেন: 'আমি যে সময়ে স্নাতক তখন এদেশে বিজ্ঞানে গবেষণা করার মতো কোন সুযোগই ছিল না, ফলে আমাদের অধ্যাপকরা তাঁদের প্রতিভাবান ছাত্রদের সরকারী চাকরির জন্য কোন একটা প্রতিযোগিতামূলক সর্বভারতীয় পরীক্ষা দেবার জন্য পরামর্শ দিতেন। তখন ভারতীয়দের যে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হতো তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা যাতে সুদক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে ভারতীয় প্রতিভাবান যুবকদের ঠিক সেইভাবে তৈরি করা।'

যুবক রমনকে তাই সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তবে তাঁর সৌভাগ্যক্রমে চাকরি জীবনের দশ বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতায় অতিবাহিত হয়েছিল যদিও কর্মজীবনের গোড়াতেই রমনকে স্বল্পকালের জন্য রেঙ্গুন ও নাগপুরে বদলি হতে হয়েছিল। তখন ব্রহ্মদেশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সরকারী চাকরি গ্রহণ করলেও রমনের ভেতরে যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ছিল তাকে একপাশে সরিয়ে রাখা বা মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। অবসর সময়টা তিনি বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়েই থাকতেন। অফিস ও বাড়িতে তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয় ছিল বিজ্ঞান—বিজ্ঞান ভিন্ন তিনি যেন তাঁর অস্তিত্ব চিন্তাই করতে পারতেন না।

উনিশ বছর বয়সে শুরু হয় রমনের কর্মজীবন।

তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনও নতুন পথ পেয়ে যায় এই সময়।

উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাপূর্ণ কর্মজীবনের মধ্যে তরুণ রমন বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তাকে। তাঁর সুস্থ বৈজ্ঞানিক মন আবার সচেতন হয়ে উঠলো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই ঘটনাটির কথা বইয়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে। সেদিনের সন্ধ্যায় দুশো দশ নম্বর বৌবাজার স্ট্রীটে সেই ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁর বিজ্ঞান সাধনার উপযুক্ত স্থান বলে মনে হয়েছিল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন রমন সেদিন। এমন একটি সংস্থা তিনি হয়তো মনে মনে কামনা করছিলেন। অন্যদিকে সংস্থার সম্পাদক ডক্টর অমৃতলাল সরকারও বোধ হয় এমনি এক বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সন্ধান করছিলেন।

বলেছি এই সময়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনও একটা নতুন পথ পেয়ে গিয়েছিল। এই সংস্থার মধ্য দিয়ে রমন আরো একজনের সংস্পর্শে এলেন। তিনি স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং নিত্য নতুন প্রতিভার খোঁজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রতিভার আগুন তাঁর কাছে চাপা থাকত না। রমনকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। অন্যদিকে রমনের কাছেও আশুতোষের সান্নিধ্য যেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বহন করে নিয়ে এলো। অবশ্য এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন ডক্টর সরকারের কাছেই; তিনি তাঁকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি যাতে গবেষণার কাজ করতে পারেন অমৃতলাল বাবু তার সকল সুযোগই রমনকে করে দিয়েছিলেন। এইখানে দীর্ঘকাল গবেষণা করার পর রমন আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'রমন এফেক্ট' যার জন্য তিনি লাভ করেন দুর্লভ নোবেল পুরস্কার।

বৌবাজারের সেই বৈজ্ঞানিক সংস্থা—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্সের পৃষ্ঠপোষকতায় রমন তাঁর গবেষণা

চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু খুব বেশি দিন তিনি কলকাতায় থাকার সুযোগ পেলেন না। রেঙ্গুনে বদলি হয়ে গেলেন। সেখানেও অবশ্য তাঁকে বেশিদিন থাকতে হয়নি। ১৯১০ সালে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি মাদ্রাজ চলে আসেন। তারপর চলে গেলেন নাগপুর। রমন তখন ডেপুটি এ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল। তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে সরকারী কাজে এই কয় বছরের মধ্যে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। রেঙ্গুন ও নাগপুরে যে স্বল্পকাল তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছিল সেই সময়েও তিনি গবেষণার কাজ থেকে বিরত ছিলেন না, বরং ক্রমাগত তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে এক মনে।

এই সময়ের মধ্যেই রমন পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে ত্রিশটি মৌলিক প্রবন্ধ 'নেচার', 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন' ও 'ফিজিক্যাল রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না অন্য কোন বিজ্ঞানীর জীবনে। এর থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, 'অফিসের রুটিন বাঁধা কাজ করলেও, কিন্তু মন তাঁর সর্বক্ষণের জন্য নিবদ্ধ থাকত বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার মধ্যে। তিনি যখন নাগপুরে ছিলেন তখনকার একটা ঘটনা বলি। এখানকার একজন নাগরিকের বাড়িতে একবার অগ্নিকাণ্ডের ফলে তার গৃহে সঞ্চিত ত্রিশ-চল্লিশখানা একশো টাকার নোট পুড়ে যায়। নোটগুলির অর্ধেক অংশ আগুনে পুড়ে যায়নি। লোকটি উদ্বিগ্ন-চিত্তে সেই আধপোড়া নোটের বাণ্ডিল হাতে নিয়ে এ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলের অফিসে এলো। তার মনে অবশ্য কোন আশাই ছিল না। অন্য কোন অফিসার হলে তিনি তৎক্ষণাৎ লোকটিকে চলে যেতে বলতেন। কিন্তু রমন আধ-পোড়া নোটের বাণ্ডিলটি একটা ম্যাগনি-ফাইং গ্লাস দিয়ে একটি একটি করে পরীক্ষা করলেন এবং খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দিলেন এইগুলির বদলে লোকটিকে যেন নতুন নোট দেওয়া হয়।

—স্যর, এ নোটগুলো যে একবারে পুড়ে গেছে।

—পুড়ে যে গেছে সে তো আমিও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু লক্ষ করে দেখুন একটা নোটেরও নম্বর পুড়ে যায়নি।

—তা যায়নি, স্যর।

—তাহলে প্রমাণ কি হয় ? প্রমাণ হয় যে, এটা সাজানো ব্যাপার নয়, সত্যি আগুন লেগেছিল। কাজেই লোকটিকে আমরা আগুনে পোড়া নোটের বদলে নতুন নোট দিতে পারি।

এই ঘটনাটি থেকে রমন-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি সেটি হলো এই যে, যে কোন সমস্যাই তাঁর কাছে আসত, তিনি তা খুঁটিয়ে দেখতেন ও তার সমাধান খুঁজে বের করতেন। বৈজ্ঞানিকের মনের ধরনই এই। অবশেষে ১৯১১ সালে রমন তাঁর প্রিয় শহর কলকাতায় এলেন ডাক ও তার বিভাগের এ্যাকাউন্টাণ্ট জেনারেল হয়ে। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ বছর। এর আগে আর কোন ভারতীয় এমন উচ্চ এবং দায়িত্বজনক পদে অধিষ্ঠিত হন নি। এই সম্মান লাভ নিঃসন্দেহে তাঁর যোগ্যতার পরিচায়ক ছিল। কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর রমনকে আবার দেখা গেল বৌবাজার স্ট্রিটের সেই দুশো দশনম্বর বাড়িটায় অবসর সময়ে এসে গবেষণার কাজ করতে। আশুতোষের সঙ্গে তিনি এই সময়েই পরিচিত হয়েছিলেন। আশুতোষ তখন হাইকোর্টের বিচারপতি, এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক সমিতির সভ্য আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর কাছে প্রতিভার আগুন চাপা থাকত না। প্রথম পরিচয়েই রমনকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ তখন গঠনের পথে আর সেই সময় থেকেই তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন যে, প্রতিভাবান এই যুবককে তাঁর পরিকল্পিত বিজ্ঞান কলেজে নিয়ে আসবেন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে।

বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হওয়ার ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে বলা দরকার। একালের যে তিনজন ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানীর প্রতিভার স্ফুরণে এই বিজ্ঞান কলেজ বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল তাঁরা হলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহা।

আর এই তিনজন ও আরো দু'একজনকে এখানে কাজ করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন আশুতোষ। বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হওয়ার ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার যে দুজন সুসন্তানের নাম জড়িয়ে আছে তাঁরা হলেন স্যর তারকনাথ পালিত ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ। এই দুই দানবীরের দানকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছিল বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের কাজ। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সেদিন ভারত সরকারের কাছে টাকার জন্য আবেদন করেছিলেন। যে কোন কারণেই হোক ভারত সরকার এবিষয়ে অর্থ সাহায্যের তেমন ভরসা দিলেন না।

কিন্তু সেজন্য কিছুমাত্র নিরাশ হলেন না আশুতোষ। সহযোগী হিসাবে পেলেন ডাঃ নীলরতন সরকারের মত আরও কয়েকজন মানুষকে। ১৯১৪ সালের ২৭ মার্চ কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের সামনে ৯২ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে তিনি বিজ্ঞান কলেজ ভবনের শিলান্যাস করেন। ঐ বছরের জুলাই মাসে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল, তিন বছর পরে যুদ্ধ থেমে যায় এবং তখন থেকে অর্থাৎ ১৯১৭ সাল থেকে বিজ্ঞান কলেজের কাজ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। স্যর তারকনাথ পালিত ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ বিভিন্ন দফায় যে বিপুল টাকা বিজ্ঞান কলেজের জন্য দান করেন তা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে পালিত অধ্যাপক এবং ঘোষ অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। এই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও অন্য যে মানুষটির অবদান ছিল. তিনি হলেন ডাঃ নীলরতন সরকার। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সেকালের বিখ্যাত 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ও ডাঃ নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ জামাতা অশোক চট্টোপাধ্যায় একসময় বলেছিলেন "...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ ঐ সময়ে অর্থের অভাবে কোনও মতেই গড়িয়া তোলা সম্ভব হইতেছিল না। একটা ক্ষুদ্র গৃহ ও অনেকটা জমি স্যার নীলরতন সরকার কোন কারখানা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থলে অর্থের

ব্যবস্থা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষালয় নির্মাণ করা হইবে পরিকল্পনায় ঐ গৃহ ও জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে নাম খারিজ করিয়া দিয়া দেন। এই সময়ে স্যার নীলরতনের সহিত স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারক নাথ পালিতের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এবং তাঁহাদের সহিত চিকিৎসকের কার্যে ও বন্ধুত্বের খাতিরে প্রায় প্রত্যহই সাক্ষাৎ হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষালয় গঠনের একান্ত আবশ্যকতার কথা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করার ফলে তাঁহারা উভয়েই বহু লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালকে দান করেন।...পদার্থ বিদ্যায় প্রথম পালিত অধ্যাপক স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৪—এই সতেরো বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পালিত অধ্যাপকরূপেই ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয় তথা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি যখন এই দুর্লভ পুরস্কার পান তখন স্যার আশুতোষ জীবিত ছিলেন না; এর ছয় বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞান কলেজের প্রধান অধ্যাপকের সন্ধান করতে গিয়ে আশুতোষ প্রথমেই স্মরণ করলেন রমনের কথা। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা আশুতোষের অজানা ছিল না। একদিন তিনি সেনেট হাউসে রমনকে ডেকে পাঠালেন। প্রদেশের এ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল হলেও রমন খুবই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। আশুতোষের বিরাট ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী পাণ্ডিত্য আর সাংগঠনিক প্রতিভা তরুণ রমনকে প্রবলভাবেই তাঁর প্রতি আকর্ষণ করেছিল। তাই উপাচার্যের আহ্বানে তিনি একদিন বিকেলে সেনেট হাউসে এসে আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

—আমার ইচ্ছা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক তোমাকে করি। কিন্তু একটা কথা আছে।

—কি বলুন?

—তোমার যোগ্যতার প্রশ্ন উঠছে না, একটা অন্য বাধা দেখা

দিয়েছে। স্যর তারকনাথ পালিতের উইলে আছে যে, য়ুরোপ থেকে প্রত্যাগত একজনকে এই পদে নিযুক্ত করতে হবে। তোমাকে একবার বিলেত যেতে হবে।

—আমি কিন্তু বিলেত যেতে রাজী নই।

—কেন ?

—আমি মনে করি এই শর্ত ভারতীয় শিক্ষার পক্ষে অবমাননাকর স্বাধীনচেতা আশুতোষ যুবক রমনের এই যুক্তি উপলব্ধি করলেন। তখন শর্তটি উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হলো। বিজ্ঞান কলেজের প্রথম পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন রমন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ঘটনার বছর দুই বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন ডাঃ নীলরতন সরকার। তিনি তাঁর কার্যকালের মধ্যে আরও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, অধ্যাপক আদারকর ও অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু টাকা বেতনের ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সরকারী চাকরিতে তিনি ইস্তফা দিলেন। তখন থেকে তিনি বিজ্ঞানলক্ষ্মীর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন। টাকার দিক থেকে সেদিন এই বিজ্ঞানীকে যে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল এদেশে তার দৃষ্টান্ত বিরল বললেই হয়। এই ঘটনার অনেক বছর পরে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আশুতোষের এই দূরদর্শিতার প্রশংসা করে বলেছিলেন : 'স্যর আশুতোষ যদি রমনকে ভারত সরকারের অর্থবিভাগের চাকরি ত্যাগ করে বিজ্ঞানের সাধনায় উৎসাহিত না করতেন তাহলে তিনি হয়ত একজন সুদক্ষ এ্যাকাউন্টাণ্ট জেনারেল হিসাবে অবসর গ্রহণ করতেন। 'রমন আবিষ্কার করেছেন 'রমন এফেক্ট' (Raman effect) আর আশুতোষ আবিষ্কার করেছিলেন রমন এফেক্টের আবিষ্কর্তাকে।'

উনত্রিশ বছর বয়সে মাসিক দু' হাজার টাকা মাইনের অতবড়

চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন সেদিন বিজ্ঞান কলেজে হাজার টাকা বেতনে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন সেদিন সেনেটের এক সভায় দাঁড়িয়ে কৃতবিদ্য এই যুবকের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করে আশুতোষ বলেছিলেন ঃ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদটির জন্য আমরা চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের মত একজন সুযোগ্য মানুষকে পেয়েছি। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বহুবিধ মৌলিক গবেষণা করে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। সকলেই জানেন সে-সব গবেষণা তাঁকে কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই না করতে হয়েছিল। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকরি করেছেন আবার অবসর সময়ে নিজের গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। উচ্চ বেতনের ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সরকারী চাকরির বিনিময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প বেতনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এদেশে স্বার্থত্যাগ ও সাহসের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তার তুলনা নেই। তাঁর এই দৃষ্টান্ত দেখে আমার মনে এই আশার সঞ্চার হয়েছে যে, আমরা যে জ্ঞান-মন্দির গড়তে চলেছি সেখানে সত্যনিষ্ঠ পূজারীর কোন অভাব হবে না।'

রমন সম্পর্কে আশুতোষের এই প্রশংসাসূচক অভিমত বিশেষ-ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। দেশের তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশুতোষের এই অভিমত আর সেই সঙ্গে যে মানসিকতা নিয়ে রমন সরকারী চাকরি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত সেদিন গ্রহণ করেছিলেন—এই দুটি বিষয়েরই গুরুত্ব অপরিসীম। আগেই বলা হয়েছে যে, তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করার কথা ভারতবর্ষে বড় একটা শোনা যেত না। তাই তো দেখা যেত যে, রমনের মতো সেরা ছাত্ররা তখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করেই সোজা চলে যেতেন সরকারী দপ্তরে বড়ো চাকরি নিয়ে। রমন যে পার্থিব প্রলোভনের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কম মাইনের শিক্ষকতার চাকরির সঙ্গে উঁচু মাইনের চাকরি বিনিময় করতে পেরেছিলেন সহজভাবে—এটি নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ ঘটনা ছিল আমাদের দেশে। খুব

কম লোকেরই এমন সাহস থাকে। উনত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবনে হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত তখন ঐ রকম সম্মানিত উচ্চপদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাস্টারির চাকরি গ্রহণ করার মধ্যে যে সাহসের পরিচয় আছে তার মধ্যেই আমরা যেন প্রত্যক্ষ করি চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের ভিতরকার সেই মানুষ যিনি তাঁর ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই শুনেছিলেন বিজ্ঞানলক্ষ্মীর হাতছানি। আশুতোষের নির্বাচন যেমন ভুল হয়নি তেমনি যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রমন অধ্যাপনার কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন তা অচরিতার্থ থাকে নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯১৭ সালে রমন যখন বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন সেই একই বছরে আশুতোষ তিনটি তরুণ বাঙালি প্রতিভাকে এখানে এনেছিলেন লেকচারার হিসাবে। তাঁরা হলেন সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। আবার এই বছরেই আবিষ্কৃত হয়েছিল বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সুবিখ্যাত যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ। ১৯১৭ সালটি তাই ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আচার্য রমনের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার স্থাপিত ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স। এই সংস্থাটির সংস্পর্শে আসা তাঁর জীবনের একটি প্রধান ঘটনা, একথা বিজ্ঞানী নিজেই বলেছেন। কলকাতায় সরকারী চাকরিতে প্রবিষ্ট হওয়ার অল্পদিন পরে তিনি যখন হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় পথ চলতে চলতে এটি দেখতে পেয়েছিলেন তখন এ্যাসোসিয়েশনে কর্মচাঞ্চল্য বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে এখানে বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা হতো। এ্যাসোসিয়েশনের ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত ছিল এবং এর যন্ত্রপাতির সংগ্রহ মন্দ ছিল না। যন্ত্রগুলি অবশ্য পুরাতন আর সেগুলি বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে ব্যবহার করা হতো।

সংস্থার সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় রমন এইখানে কাজ করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তাঁকে সেই অনুমতি সঙ্গে

সঙ্গেই দেওয়া হয়। এর অল্পকাল পরেই তিনি সংস্থার সন্নিকটে একটা বাড়ি ভাড়া করে সেইখানে বসবাস করতে থাকেন যদিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে এই রকম জনাকীর্ণ ও কোলাহল পূর্ণ পরিবেশ আদৌ অনুকূল ছিল না! কাজের সুবিধা হবে বলে তাঁর বাসা আর এ্যাসোসিয়েশনের সীমানা দেওয়ালের মধ্যে একটা দরজা করে নিয়েছিলেন রমন। এটা করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দিনে অথবা রাতে যে কোন সময়ে তিনি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কাজ করতে পারবেন। এর থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছিল যে, তাঁর সময় ও শ্রমের যতটা সম্ভব তা রমন বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত করতে পারবেন। ১৯১৯ সালে, অমৃতলাল সরকারের মৃত্যুর পর রমন এই সংস্থার অবৈতনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর পক্ষে দুই জায়গার ল্যাবোরেটরি ব্যবহার করার সুযোগ হয়—বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার ল্যাবোরেটরি আর এখানে এ্যাসোসিয়েশনের পরীক্ষাগার। বলা বাহুল্য, এর ফলে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিকশিত হওয়ার অনেক সুবিধা হয়েছিল।

'এই সময়টাই ছিল আমার জীবনের স্বর্ণযুগ'—উত্তরকালে এই কথা প্রায়ই বলতেন আচার্য রমন। বিজ্ঞান কলেজ ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স—এই দুটি স্থানে তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি তরুণ ছাত্রগোষ্ঠী। সেই ছাত্রগোষ্ঠীকে তিনি বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিতেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার একটা নতুন পরিবেশ সেই সময় এ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল—বহু তরুণ গবেষককে তখন এখানে ভিড় করে আসতে দেখা গিয়েছিল। রমন নিজে খুব সকাল সকাল এখানে আসতেন ও প্রায় সারা দিন গবেষকদের কাজকর্মে তত্ত্বাবধান করতেন। ২১০ নম্বর বৌবাজারের সেই বাড়িটি সেদিন ভারতের নানা অঞ্চল থেকে অনেক গবেষককে আকর্ষণ করে এনেছিল। এ্যাসোসিয়েশনের ল্যাবোরেটরির উন্নতির

জন্য যেসব সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল, রমন সেজন্য বহুস্থান থেকে অর্থসংগ্রহ করেছিলেন। কয়েকজন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকও রমনের আকর্ষণে এখানে যোগদান করেছিলেন ; এঁদের অনেককেই রমন তাঁর গবেষণা কাজে সহায়ক হিসাবে পেয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর নিজস্ব গবেষণা প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে গিয়েছিল।

আচার্য রমন তাঁর সেই সময়কার গবেষণার কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ 'বৌবাজারের যে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি এতকাল মৃতকল্প ছিল, যেখানে প্রাণের কোন স্পন্দন ছিল না, ছিল না গবেষণার যথার্থ পরিবেশ—সেইখানে ১৯১৭ সালের পর এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়। স্যর আশুতোষের অনুরোধে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করার পর থেকে আমি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাণ সঞ্চার করবার চেষ্টা করে থাকি এবং আমার সেই প্রয়াসের ফলে অল্পকালের মধ্যেই এখানে দেখা দিতে থাকে নতুন কর্মব্যস্ততা, সত্যিকারের গবেষণার আবহাওয়া। অনেক তরুণ গবেষক, কয়েকজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বিভিন্ন স্থান থেকে এলেন এখানে। সকলেই বিজ্ঞানলক্ষ্মীর আরাধনায় রত হলেন। এঁদের মধ্যে আমি কয়েকজনকে আমার কাজের সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলাম। আমি তখন যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতাম সেগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের, যথা—কম্পন ও শব্দ . বাদ্যযন্ত্রের তত্ত্ব ; চৌম্বক তত্ত্ব ; আলোকবিজ্ঞান ও আলোক তরঙ্গের আণবিক বিস্তার এবং বর্ণ ও বর্ণালি ইত্যাদি।'

রমনের সময়ে দুশো দশ নম্বরের বাড়িটি থেকে ক্রমাগত বেরুতে থাকে একের পর এক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এবং সেগুলি দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে এ্যাসোসিয়েশনের নামকে বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত করে তুলেছিল। তখন থেকে এখানে শুরু হয়েছিল রমনের নিয়মিত সান্ধ্য-বক্তৃতা। ক্রমে সেইসব বক্তৃতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যাদের মধ্যে আগ্রহ ছিল তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় এখানে আসতেন রমনের

বক্তৃতা শুনতে। বাঙালি তথা ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা শুরু থেকে—অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতার এই স্বপ্নকে সেদিন এইভাবে সার্থক করে তুলেছিলেন আচার্য রমন। তাইতো তিনি বলতেন: 'এই সময়টাই ছিল আমার জীবনের স্বর্ণযুগ।'

॥ তিন ॥

১৯২১। বিজ্ঞানী রমনের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

এই বছরে তিনি প্রথম বার সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তিনি য়ুরোপ যাত্রা করলেন। সে বছর গ্রীষ্মকালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কংগ্রেস বসেছিল। রমন সেই কংগ্রেসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর এবং সেই সময়ের মধ্যে য়ুরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা-ই তাঁকে ওদেশের বিজ্ঞানী সমাজে সুপরিচিত করে তুলেছিল। ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞানীরা, তাঁকে স্বাগত জানালেন। ইংলণ্ডে এসে রমন দেখলেন তাঁর দুজন পূর্বসুরি—জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতকে বিশ্বের বিজ্ঞান-মানচিত্রে স্থাপন করেছেন তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার বলে এবং এখানকার বিজ্ঞানীমহলে সর্বত্র এই দুজন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকে। এটা তাঁর কাছে খুবই ভাল লেগেছিল।

জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দেবার সময়ে ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশি দেখে রমনের বিজ্ঞানী মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে ঃ সমুদ্রের জল কেন নীল ? কোথায় এই নীল রঙের উৎপত্তি ? এই সমস্যাটির

সমাধানের চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর মনে হলো, গভীর সমুদ্রেই রঙ নীল হওয়ার আংশিক, এমন কি অনেকখানি কারণ আলোককণার বিচ্ছুরণ। সমুদ্রের জল ঐসব আলোককণাকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত করে বলে ঐ জল এমন নীল দেখায়। য়ুরোপ থেকে ফিরবার সময়ে এই বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ তাঁর আগের অনুমানকেই প্রমাণিত করল। পরে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করেছিলেন, সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

১৯২৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। এবার নিমন্ত্রণ এসেছিল ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়ান্স নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান থেকে। দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞানী সেবার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই বিজ্ঞানী দল প্রথম কানাডায় যান। এইখানে টোরোনটোতে বিজ্ঞানীদের এক সভায় আলোকের বিচ্ছুরণ বা স্ক্যাটারিন সম্পর্কে রমন একটি বক্তৃতা করেন। বিষয়টি নতুন ও চিত্তাকর্ষক ছিল, তাই সকলেই এটি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুগ্ধ হওয়ার কারণ তাঁরা যেন এর মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানের একটা নতুন দিগন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয়-বারের বিদেশ যাত্রায় তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সভ্য (F. R. S.) নির্বাচিত হন। তাছাড়া আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আর. কে. মিলিকানের আমন্ত্রণে ক্যালি-ফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে প্রায় চারমাসের বেশী সময় কাজ করেন। দেশে ফেরার আগে অধ্যাপক রমন কানাডা, নরওয়ে প্রভৃতি জায়গায়ও বৈজ্ঞানিক সফর করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কারিগরি বিদ্যার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিমন্ত্রণে রমন এখানে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে (Visiting Profe-ssor) চার মাস কাল কাজ করেছিলেন। ঐ বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত

হয় ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটে। সেই শতবার্ষিকী উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন রমন এবং ১৯২৫ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বছরে তিনি পুনরায় য়ুরোপ যাত্রা করেন। এবার নিমন্ত্রণ এসেছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান রাশিয়ান অ্যাকাদেমি অফ সায়েন্সের পক্ষ থেকে। অ্যাকাদেমির দ্বি-শতবার্ষিকী উদযাপিত হয় লেনিনগ্রাদ ও মস্কৌতে; রমন এই স্মরণীয় উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এইভাবে তিনি সেদিন বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

য়ুরোপ তথা সারা পৃথিবীতে যাঁকে বলা হয় বৈদ্যুতিক শক্তি তত্ত্বের (Electricity) জনক সেই মাইকেল ফ্যারাডের নামে ব্রিস্টলে ফ্যারাডে সোসাইটি নামে একটি সমিতি আছে। সেই সমিতির পক্ষ থেকে ১৯২৯ সালে রমন নিমন্ত্রিত হলেন। এইখানে তিনি আণবিক বর্ণালী (Molecular spectra) সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়টির উদ্বোধন করেন। এই সময়ে তিনি য়ুরোপের কয়েকটি শহর পরিদর্শন করেন ও সর্বত্রই বক্তৃতা করেন। নানা জায়গা থেকে সম্মান আসতে থাকে। ১৯২৮ সালে তাঁকে "ম্যাটেউচি মেডাল" দিয়েছিল ইতালিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্স। এবার ব্রিটিশ সরকার অধ্যাপক রমনকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করল। তাছাড়া সব জায়গাতেই বিজ্ঞানীরা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে জানায় স্বাগত আর প্রশংসা হয় তাঁর বক্তৃতার—ঠিক এর অনেককাল আগে ঘটেছিল বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের জীবনে যখন তিনি য়ুরোপে এসেছিলেন একবার নয়, বহুবার। তাঁর পূর্বসূরির মতো আচার্য রমনও মনে করতেন—এই যে তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজে এত সম্মান, এত স্বীকৃতি লাভ করেছেন; এজন্য ব্যক্তিগতভাবে গৌরব বোধ করলেও প্রকৃতপক্ষে এছিল তার মাতৃভূমির গৌরব ও গর্বের বিষয়।

১৯৩০। রমন আবার য়ুরোপে এলেন। এবার তিনি স্টকহলমে এসে গ্রহণ করলেন নোবেল পুরস্কার। এইখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আশুতোষের অনুরোধে সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯১৭ সালে

যখন তিনি বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন তখন থেকেই রমন যেন তাঁর নিজস্ব পথ খুঁজে পেলেন। তাঁর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মন যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেল। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তৎপর হয়ে উঠলেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অনাবিল অনুসন্ধিৎসু তাঁর বৈজ্ঞানিক মনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর অনেক গবেষণাই এই অনুসন্ধিৎসু মনের ফসল। এরই পরিণতি দেখা গেল রমনের বিখ্যাত আবিষ্কার রমন এফেক্ট-এ এবং পদার্থবিজ্ঞানে এই মৌলিক আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ সালে রমনকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি সেদিন এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। এহ পুরস্কার পাওয়ায় বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃত হয় রমনের প্রতিভা আর সেই সঙ্গে, বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় ভারতবর্ষের মর্যাদা।

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে রমন কলকাতায় ফিরলেন। নানা জায়গা থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। কলকাতার নাগরিকদের তরফ থেকে পৌরসভার মেয়র তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দিলেন। এসব ঘটনার কিছুদিন বাদে একদিন রমন এসে ঢুকলেন তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর গবেষণাগারে। বললেন, "আমি মাদ্রাজে যদি গবেষণার সুযোগ পেতাম তাহলেও আমার পক্ষে এই যুগান্তকারী কাজ করা সম্ভব হতো না। কারণ সেখানকার কর্তৃপক্ষ নূতন কিছু ভাবতে পারে না।" কথা প্রসঙ্গে তিনি বারবারই বললেন যে তাঁর সমস্ত গবেষণার মূলে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স।

১৯৩২। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় ('সোরবোর্ন') রমনকে সম্মানিত ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেদিন প্যারিসের বিজ্ঞানীসমাজ তাঁকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছিল সে রকম শ্রদ্ধাপূর্ণ অভ্যর্থনা একমাত্র জগদীশচন্দ্রের পর আর কোনো ভারতীয় বিজ্ঞানীর ভাগ্যে ঘটেনি। এইবার প্যারিসে এসে রমন সকলের আগে সাক্ষাৎ করেন

বিজ্ঞান জগতের বিস্ময়কর প্রতিভা মাদাম ক্যুরির সঙ্গে[1]। মাদাম ক্যুরি তখন শহর থেকে কিছু দূরে একটি নির্জন বাড়িতে তাঁর এক মেয়ে ও জামাইকে নিয়ে বাস করতেন। তাঁর এই মেয়ে ও জামাই (জোলিয়ট) দুজনেই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী রমনের নাম মাদাম ক্যুরি আগেই শুনেছিলেন।

জগতবরেণ্যা এই বিজ্ঞান সাধিকা তখন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন, তবু বিজ্ঞানের সাধনায় তাঁর যেন বিরাম ছিল না। সকাল দশটার সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রমন সবিস্ময়ে দেখলেন মাদাম ক্যুরি একমনে কী যেন লিখে চলেছেন ঃ এই অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ 'আমি যখন শ্রদ্ধা জানাতে মাদাম ক্যুরির বাসভবনে এলাম তখন দ্বারপ্রান্তে সহাস্যমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন তাঁর কৃতবিদ্য জামাতা জোলিয়ট। তিনিই আমাকে সঙ্গে করে ভিতরের একটি সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের মাঝখানটিতে একটি প্রকাণ্ড টেবিল —তার একদিকে গদি-আটা চারখানি চেয়ার আর অপর দিকে আর একটি। সেইটিতে বসেছিলেন মাদাম ক্যুরি যিনি তাঁর স্বনামধন্য স্বামী প্রফেসর পিয়ারে ক্যুরির সঙ্গে একত্রে দীর্ঘকাল গবেষণা করে রেডিয়াম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর নিয়ে এসেছেন। সৌম্য ও শান্ত চেহারা, প্রতিভাদীপ্ত মুখ, মাথায় অপর্যাপ্ত শুভ্রকেশ, পরিধানে ধবধবে শাদা গাউন, শাদা জামা। একটি স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত। তাঁর চেয়ারের পিছন দিকের দেয়ালে বিলম্বিত তাঁর স্বামীর একটি ফটো। টেবিলের ওপর রাশিকৃত কাগজপত্র, বই ছড়ানো। একটা কাগজে কি যেন লিখছিলেন একমনে, বোধ হয় বৈজ্ঞানিক কোন পত্র-পত্রিকার জন্য কোন প্রবন্ধ হবে।

---

১. মাদাম পিয়ারে ক্যুরি (১৮৬৭-১৯৩৪) দু'বার নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন ; প্রথমবার ১৯০৩ সালে তাঁর স্বামী পিয়ারে ক্যুরির সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞান আর দ্বিতীয়বার রসায়নবিদ্যায় ১৯১১ সালে। এছাড়া তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য শতাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার, পদক ও সম্মান লাভ করেছিলেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানি আমার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে আমাকে সহাস্যমুখে অভ্যর্থনা করলেন। —আসুন প্রফেসর রমন। আপনি বিজ্ঞানজগতের একটি জ্যোতিষ্ক। আপনার আবিষ্কার একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। আপনি অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। মাদাম ক্যুরি যখন এই কথাগুলি বললেন তখন আমি নিজেকে খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম। কোথায় বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধিকা আর কোথায় আমি একজন গবেষক। তারপর ঐ ঘরেরই এক কোণে যখন কফির টেবিলে তিনি আমাকে আপ্যায়িত করলেন, নিজের হাতে কফি তৈরি করে আমাকে দিলেন তখন আমি তাঁর স্নেহ ও যত্নে অভিভূত না হয়ে পারিনি। য়ুরোপের অনেক বিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু মাদাম ক্যুরির মতো এমন মানবিক গুণসম্পন্না বিজ্ঞানসাধিকা আমি আর দেখিনি।

১৯৩৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে মাদাম ক্যুরি যখন মারা যান তখন রমন এই বিজ্ঞানসাধিকার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন এইভাবে: 'বিশ্বের এমন কোন বৈজ্ঞানিক সংস্থা নেই যা এই প্রতিভাময়ী নারীকে সম্মানিত না করেছে আর এমন কোন বিজ্ঞানী নেই যিনি তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিজ্ঞানজগতের যে ক্ষতি হলো তা কোনদিন পূর্ণ হবে না। যাঁর আবিষ্কার ব্যতিরেকে পারমাণবিক বিস্ফোরণ কোনদিন সম্ভবপর হতো না, সেই মাদাম ক্যুরি কোনদিন খ্যাতির অন্বেষণ করেননি— প্রকৃতপক্ষে তিনি জানতেন না কেমন করে খ্যাতি অর্জন করতে হয়। তাঁর সমস্ত সত্তা নিবেদিত হয়েছিল বিজ্ঞানের সাধনায় আর সেই সাধনা, সকলেই জানেন, কি অপরিসীম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর স্বামী পিয়ারে ক্যুরিও ছিলেন একজন স্বনামধন্য প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক। বস্তুত বিজ্ঞানজগতে এই দম্পতির চরিত্র ও

সাধনা যেমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তেমনি নতুন গবেষকদের কাছে হয়ে থাকবে আদর্শস্থল।'

১৯৩৩, এপ্রিল মাস।

বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়ান্স-এর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এলো রমনের কাছে ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করবার জন্য। এ বড়ো কম সম্মানের বিষয় ছিল না। এর আগে আর কোন ভারতীয় এই পদে নিযুক্ত হননি। তাঁর পক্ষে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার অর্থ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। আর এই কাজটিও রমনের পক্ষে কম কঠিন ছিল না। নীতিগত বিচারেও এই তুটি সংস্থা ত্যাগ করে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে শোভন ছিল না, সঙ্গত ছিল ছিল না। কারণ এই তুটি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই তাঁর গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। যার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়েছিল এবং তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাছাড়া, রমনের নিজের কথায়, অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রশাসনমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা কতদূর সমীচীন হবে সেটাও বিশেষভাবে ভেবে দেখার বিষয় ছিল।

রমন তাই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না। তিনি এক বছরের কিছু বেশি সময় ছুটি চাইলেন ও সেই সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়ান্সের পরিচালকের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর চিঠিতে রমন পরিষ্কার ভাবেই লিখলেন : 'আমি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, কারণ আমি আমার অধ্যাপনার পথটি খোলা রাখতে চাই। একজন বিজ্ঞানীর জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চাকরি অপেক্ষা পরিচালকের পদ সুবিধাজনক কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রমন কলকাতার পাট চুকিয়ে বাঙ্গালোরে চলে

যান এবং ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৮ এই পনর বছর কাল পর্যন্ত তিনি এইখানেই দি ইনস্টিট্যুট অব সায়ান্সের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয় এবং এই জাতীয় সংস্থা হিসাবে এটিই ছিল ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রমন এখানে যোগদান করার আগে পর্যন্ত এখানে পদার্থবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনি এখানে আসবার পর এখানে এই বিষয়টির পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থার ফলেই পদার্থবিজ্ঞানের বহু তরুণ ছাত্র ও গবেষক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানে যোগদান করতে থাকেন। কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে একদা পালিত অধ্যাপক রমনকে কেন্দ্র করে যেমন একটি নতুন ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, বাঙ্গালোরেও তাঁকে কেন্দ্র করে তেমনি একটি ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। একদা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কেন্দ্র করে যেমন এক নবীন রাসায়নিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, আচার্য রমনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে পদার্থবিজ্ঞানের এক নবীন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল যাদের 'সাউথ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ফিজিক্স'—এই নামে অভিহিত করা হতো। রমনের হাতে তৈরি এই নবীন বিজ্ঞানীদের অনেকেই ভারতবর্ষে নানা দায়িত্বজনক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। পিতা যেমন পুত্রের মধ্যে বেঁচে থাকেন, আচার্যও তেমনি বেঁচে থাকেন তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে। এরই দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য রমনের জীবনে।

রমন বাঙ্গালোর ইনস্টিট্যুটের প্রথম ভারতীয় পরিচালক হিসাবে যখন যোগদান করেন তখন তিনি 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার করে বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে খ্যাতিলাভ করেছেন ও এর স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন দুর্লভ নোবেল পুরস্কার। কাজেই একথা বলা চলে যে যখন তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে তখন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনকে আমরা একটি প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত দেখতে পাই।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁকে পরিচালকরূপে লাভ করে, ইনস্টিট্যুটই লাভবান হয়েছিল যেমন একদা হয়েছিল দুশো দশ নম্বর বৌবাজার স্ট্রীটের সেই প্রতিষ্ঠানটি চাকরি জীবনের শুরুতেই যার সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা স্ফুরণের পথ সুগম হয়েছিল।

॥ চার ॥

যে কয় বছর রমন কলকাতায় ছিলেন সেই সময়ে তাঁর নিজের গবেষণা ও তাঁর ল্যাবোরেটরিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সমাগত যেসব ছাত্র গবেষণা করত তা পদার্থবিজ্ঞানের বহু বিচিত্র বিষয়ে প্রসারিত ছিল। তবে দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল ; তার একটি ছিল শব্দ বিদ্যাবিষয়ক (aconties) আর অপরটি আলোকতত্ত্ব (optico) বিষয়ক। আগেই বলেছি, রমনের বাবা ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ, তিনি বেহালা বাজাতে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। তাঁর ছেলেবেলা থেকে এই বেহালা ও বেহালাজাতীয় বাজনার প্রতি রমন খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে, বড়ো হয়ে যখন তিনি বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন তখন বাদ্যযন্ত্রটি নিয়েই তিনি তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বেহালা বা বীণায় তার বাঁধা থাকে, সেই তারে আঘাত করলেই সুমধুর শব্দতরঙ্গ ওঠে। এর তত্ত্বটা বুঝবার জন্য রমন অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের আদিপর্বে।

এই প্রসঙ্গে আচার্য রমন তাঁর জীবনের একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করতেন। তিনি বলতেন : 'আমি তখন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। একদিন সকালে বাবা বেহালা বাজাচ্ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে আমার মন চলে গেল বাজনার দিকে। আমি যেন

উৎকর্ণ হয়ে সেই সুমধুর বাজনা শুনতেশুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। বাদকের হাতের দ্রুত সঞ্চালনে ও নানাভাবে সঞ্চালনের ফলে বেহালার বুকের তারগুলি থেকে যে অপূর্ব সুমধুর ধ্বনি-তরঙ্গ উঠছিল তার কম্পনের বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে শব্দের যে লীলায়িত স্পন্দন আমার কর্ণ-পটাহের মধ্যে এসে আঘাত করছিল আমি মুগ্ধভাবে তার রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করলাম। কিন্তু রহস্য ভেদ করার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। বিষয়টি আমার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল সেই সময়ে। বিষয়টি আমার মগজের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। কলেজে এসে যখন পদার্থ বিজ্ঞান পাঠ করলাম তখন থেকে আমার শৈশব-কালের সেই অনুসন্ধিৎসা আরো তীব্র হয়। আমি নিজেও বাবার কাছে অল্প-স্বল্প বেহালা বাজানো শিখেছিলাম আর যখনই বেহালা হাতে তুলে নিয়ে তার বুকে ছড়টি টানতাম নানাভাবে, শুনতাম আর বুক থেকে উঠতো নানা ধরনের শব্দ। কী এর রহস্য ?—এই চিন্তা আমাকে তখন থেকে প্রবলভাবে পেয়ে বসে। বেহালার গঠনটি বেশ করে পর্যবেক্ষণ করলাম ; এর নানা অংশ ভালো করে দেখলাম ঃ 'বেহালার বুকে সটানভাবে কয়েকটি তার বাঁধা রয়েছে ধনুকের ছিলার মতো। বেহালার গায়ে সটানভাবে যে তারগুচ্ছ বাঁধা, সেগুলির নীচেকার অংশ যে ক্ষুদ্র সেতুটির ওপর দিয়ে প্রসারিত হয়েছে তার ফলেই কি কম্পনের বা শব্দ তরঙ্গের বৈচিত্র্য যন্ত্রটির বুক থেকে ওঠে ?'

এই কৌতূহল, এই প্রশ্ন রমনকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, পরে তিনি মৃদঙ্গ ও তবলা নিয়েও শব্দতত্ত্বের পরীক্ষা করতে থাকেন। তিনি মৃদঙ্গ ও তবলার গঠন পারিপাট্য পরীক্ষা করে বুঝবার চেষ্টা করলেন এই যন্ত্র দুইটি থেকে উত্থিত শব্দতরঙ্গ থেকে ধ্বনি মাধুর্যের অমন সুসঙ্গতি সম্ভব কি করে ? তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবে যে, তবলা বা মৃদঙ্গের গোলাকার মুখ। বিজ্ঞান বলে, এই প্রকার যন্ত্র থেকে উত্থিত শব্দতরঙ্গের মধ্যে সুসঙ্গতি একেবারেই সম্ভব নয়। রমন পরীক্ষা করে দেখলেন ভারতীয় এই যন্ত্র দুটির মুখের আবরণ নরম

চামড়া জাতীয় জিনিস দিয়ে আচ্ছাদিত। এর ফলে বেহালার মতো মৃদঙ্গ ও তবলা থেকে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা সুসঙ্গত ধ্বনি মাধুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই পরীক্ষার সবটাই তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের ল্যাবোরেটরিতে করেছিলেন ও তাঁর সেইসব পরীক্ষার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে এসোসিয়েশনের বুলেটিনে প্রকাশিত হতো। রমনের এই সময়কার গবেষণার ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে এই বুলেটিনগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। এইগুলির মধ্যে ১৫ সংখ্যক বুলেটিনটির মধ্যে আমরা বেহালাজাতীয় তারের বাদ্য যন্ত্র নিয়ে রমনের এই বিস্ময়কর গবেষণার পূর্ণ বিবরণ পাই। এই বিবরণ যেমন বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি এক তরুণ বিজ্ঞানীর প্রাথমিক গবেষণার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস। এ্যাসোসিয়েশনের এই বুলেটিনগুলি য়ুরোপের একাধিক বৈজ্ঞানিক সংস্থায় পাঠানো হতো। সেইগুলি পাঠ করে বিজ্ঞানজগতে শব্দতত্ত্ব বিষয়ে যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে সে বিষয়েও দেশের বিজ্ঞানীদের মনে কোন সংশয় রইল না।

এমন সময়ে জার্মানির একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে বৌবাজার স্ট্রিটের ঠিকানায় অধ্যাপক রমনের নামে একটি চিঠি এলো। সেই চিঠিতে Handbuck Der physik পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্রে বিজ্ঞান সম্পর্কে (on the physics of musical instruments) একটি প্রবন্ধ লিখবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। সাধারণত এই ধরনের অনুরোধ করা হতো না—বিশেষ করে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে ওদেশের বিজ্ঞানীদের মনোভাব যে অনুকূল ছিল তা নয়। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবির্ভাবের পর থেকে এবং তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয়ের গুরুত্ব ও নতুনত্ব অনুধাবন করে, য়ুরোপের বিজ্ঞানীসমাজের এই মনোভাবের অনেকটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তাইতো আচার্য রমন বলতেন, স্যর জে. সি. বোসই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী জগতে

আমাদের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতিলাভের পথ অনেকখানি সুগম করে দিয়ে গেছেন।[২] . একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য !

জার্মানির ঐ পত্রিকার জন্য রমন ঐ প্রবন্ধটি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। যথাসময়ে (১৯২৭) উক্ত পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। জার্মানি থেকে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীকে প্রবন্ধ লিখবার জন্য নিমন্ত্রণ করা ঐ সময়ে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের পর রমনই ছিলেন তৃতীয় ভারতীয় বিজ্ঞানী যাঁর প্রতি য়ুরোপ এই রকম সম্মান প্রদর্শন করেছিল।

তাঁর কলকাতায় অবস্থানকালে নিঃসন্দেহে রমনের গবেষণার শ্রেষ্ঠ বিষয় ছিল সাধারণভাবে আলোকবিজ্ঞান (optics) আর বিশেষ করে আলোকের বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণ। তিনি সমগ্র বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি দেখলেন : আলোক তরঙ্গ যদি কোন কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের অণুদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়, আর এই অণুগুলির স্পন্দন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিক্ষিপ্ত আলোকের বর্ণালীতে এমন কতকগুলি রেখা দেখা যায় যার সংশ্লিষ্ট তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (frequency) একটি সূত্র-সমষ্টির দ্বারা পাওয়া যায়। এই বিষয়টি ১৯২৩ সালে কোয়ান্টাম সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্ত্বীয়ভাবে (অর্থাৎ theoretically) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্মেকল। রমন ১৯২৮ সালে তা হাতে কলমে পরীক্ষায় সপ্রমাণ করেন। অণুদের স্পন্দন বা চূর্ণনের পরিবর্তনের ফলে যেসব তরঙ্গ সৃষ্ট হয় তা এই রকম বর্ণালীতে স্পষ্ট হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'রমন বর্ণালি' (Raman spectra)। এই বর্ণালী থেকে আণবিক সংযুতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কেন পাওয়া যায় ? কারণ অণুদের স্পন্দন বা ঘূর্ণনের ফলে যে শক্তির

২। ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এই বিজ্ঞানীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে রমন এই কথা বলেছিলেন।

উদ্ভব হয় সেই শক্তি অবশ্যই নির্ভর করে তাদের ভেতরকার আকার, ভার ও বিন্যাসের ওপর। তাঁর এই আবিষ্কারই পদার্থ বিজ্ঞানে 'রমন প্রভাব' (Raman Effect) বলে স্বীকৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে মৌলিক আবিষ্কারের তালিকায় রমনের এই আবিষ্কার আজ গৌরবের স্থান পেয়েছে। এই আবিষ্কারের জন্যই তো তাঁকে দেওয়া হয়েছিল দুর্লভ নোবেল পুরস্কার।

বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার করে বলি। এক-রঙা কোন আলোকরশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থের (তরল বা গ্যাসীয়) ভেতর দিয়ে পরিচালিত করলেঐ আলোকরশ্মির কতকাংশ আলোকের গতিপথের লম্ব-দিকে বিচ্ছুরিত হয়। ঐ বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালি (Spectrum) পরীক্ষা করলে মূল আলোকরশ্মির বর্ণরেখার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কয়েকটা বর্ণরেখা দেখা যায়। এই নবাবিষ্কৃত রেখাগুলোর নামকরণ হয়েছে 'রমন-লাইনস' (Raman lines)। মাধ্যমের তরল বা গ্যাসীয় অণুগুলোর গায়ে প্রতিহত হয়ে ঐ আলোকতরঙ্গের কতকাংশ পাশের দিকে বিচ্ছুরিত হয় এবং এর ফলেই ঐ নতুন রেখাগুলোর উদ্ভব ঘটে। এক-রঙা বা একবর্ণী (monochromatic) আলোকের এই ধর্মকে বলে 'রমন-এফেক্ট' (Raman Effect)। এই আবিষ্কার, বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মতে রমন-প্রতিভার একটি মৌলিক অবদান। এই তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের কম্পাঙ্ক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

নোবেল পুরস্কার ভিন্ন বিলাতের রয়্যাল সোসাইটি থেকে রমন লাভ করেছিলেন একটি সোনার পদক (Hughes Medal); যে কোন বিজ্ঞানীর কাছে এই পদক লাভ খুব সম্মানজনক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে রয়্যাল সোসাইটির এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রমনকে যখন এই পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড বলেছিলেন:

১। লর্ড রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭) পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯০৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

'অধ্যাপক ভেঙ্কট রমন আলোকবিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, বিশেষ করে আলোকের বিক্ষেপ সম্পর্কিত বিষয়ে। এই প্রসঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে, তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে আলোকের বিক্ষেপণের ফলে আলোর রঙ বদলে দেওয়া যেতে পারে। তাঁর আগে কোন কোন বিজ্ঞানী গবেষণার পর এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও এই পরিবর্তনটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। বিগত দশ বছর কালের মধ্যে পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞানে (Experimental physics) যে তিন-চারটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞান জগৎ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে সেগুলির মধ্যে 'রমন এফেক্ট' নিঃসন্দেহে একটি। তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় বহুবিধ দান ভিন্ন, অধ্যাপক রমনের আর একটি কৃতিত্ব এই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে তিনি এক নতুন গবেষকগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন।'

১৯২১ সালের কাছাকাছি সময়ে রমন যখন তাঁর গবেষণা শুরু করেন, তখন শুধু এইটুকু জানা ছিল যে কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় যে কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে নানা মাত্রায় আলোকের বিক্ষেপণ ঘটে থাকে। মনে কর একটি লেন্সের ভিতর দিয়ে সাদা আলোর একটি কিরণকে ঘনীভূত করে খুব পরিষ্কার তরল পদার্থ পূর্ণ একটি প্রকাণ্ড বাল্বের (bulb) ওপর প্রতিফলিত করা হলো। ধরো সেই বাল্বের মধ্যেকার তরল পদার্থটি হলো বেনজিন (Benzene)। তখন সূর্যের প্রত্যক্ষ কিরণমালা থেকে অবস্থিত কেউ যদি ঐ তরলপদার্থের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত আলোকের ঐ গতিপথকে আড়াআড়িভাবে প্রত্যক্ষ করে তাহলে সে তখনি বিস্ময়কর নীলাভ আলোর বিক্ষেপণ দেখতে পাবে। আগে বলা হতো এই নীলরঙ শাদা আলোর মধ্যেই বিদ্যমান ; লেন্সের ভেতর দিয়ে বেনজিন পূর্ণ বাল্বের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ার দরুনই এই বিস্ময়কর কাণ্ড অর্থাৎ নীল রঙের বিচ্ছুরণ ঘটে থাকে। রমন প্রমাণ করলেন যে, আলোকিত পদার্থের

অণুসমূহ (molecules) ও বিকিরণ—এই দুটির পারস্পরিক প্রক্রিয়ার ফলে এই আশ্চর্য বিষয়টি সংঘটিত হয়ে থাকে।

কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নবিদ্যা বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই আচার্য রমনের এই আবিষ্কার নিয়ে কাজ করার ফলে পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর এই আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানীদের এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের বোর্দো শহরে 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিল বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ। নিমন্ত্রিত হয়ে রমন এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিশজন বিজ্ঞানীর স্বাক্ষরিত এই বাণীটি সেদিন, ১৯৪৮ সালের সেই ৭ এপ্রিল তাঁর হাতে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন, তোমরা অনুমান করতে পার, সেই বিজ্ঞানীর মনের ভাবটা কি রকম হয়েছিল। সেই বাণীটি ছিল এই রকম :

'আজ বোর্দো শহরে রমন এফেক্ট আবিষ্কারের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে বহু বিজ্ঞানী সমবেত হয়েছেন। সৌভাগ্য-ক্রমে এই অনুষ্ঠানে আবিষ্কর্তা স্বয়ং উপস্থিত আছেন। মহান্ ভারতবর্ষের সতীর্থগণকে আমরা আন্তরিক অভিবাদন প্রেরণ করছি। স্যর সি. ভি. রমনের[২] বিস্ময়কর আবিষ্কারের জন্য আমরা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করছি ; সেই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানে তিনি যে নতুন গবেষক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁদের তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের কাজেরও আমরা প্রশংসা করছি। আমরা আশা করব, বিজ্ঞানের সাধনায় লিপ্ত থেকে এই প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক আরো নব নব আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানজগৎ সমৃদ্ধ করবেন।'

২। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভের পূর্বেই ভারত সরকার আচার্য রমনকে 'নাইট' (sir) উপাধিতে ভূষিত করেন।

এইভাবেই সেদিন প্রধানত রমন ও তাঁর গবেষণার ফলেই ভারতের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ভারতের বাইরে কয়েক দশক আগেই সম্মানিত ও স্বীকৃত হয়েছিল। যে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রে ও প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁদের সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আচার্য রমন সেই ধারাকে আরো প্রসারিত করে, গবেষণার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তারই ফলে বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজে ভারতের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর স্বদেশবাসী তাই তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত।

১৯৫৩ সাল।

বিজ্ঞানী রমনের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বছর।

ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতের বিজ্ঞানীরা এই বছর রমন এফেক্ট আবিষ্কারের রজত জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও এই ঘটনাটি স্মরণীয় হয়ে আছে। এই উপলক্ষে ভারতের বহু স্থানে বিশেষ সভার আয়োজন হয়েছিল, প্রদত্ত হয়েছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বহু প্রবন্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখন এই উপলক্ষ্যে মহাবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছ থেকে জনৈক সংবাদদাতা একটি বাণী প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'এক হিসাবে বলা যেতে পারে যে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টিয়ে দিয়েছে। বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞানের অগ্রগতি, পদার্থের গঠন সম্পর্কে মূল তত্ত্ব এবং সৃষ্টির বিষয়টিতে বস্তুগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা—সবই আজ আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার অংশীভূত এবং পৃথিবীর সকল জাতিই আজ এই অগ্রগতির অংশীদার। এইভাবে সি. ভি. রমনই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছেন ও প্রমাণ করেছেন যে, বস্তুর মধ্যে ফোটনের (Photon) শক্তি আংশিকভাবে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। আমার বেশ মনে আছে, তাঁর এই আবিষ্কার আমাদের মনে সেই সময়ে কী গভীর দাগই না কেটেছিল যখন আমরা বার্লিনে পদার্থ-

বিজ্ঞানের আলোচনাচক্রে যোগদান করতাম। আমি আশা করব বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে রমন তারই একজন সম্মানিত অংশীদার হিসাবে রাজনীতি-রাক্ষসের বলি না হয়ে আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।'

ব্রিটিশ পদার্থবিদ্ আর্থার এডিংটন ঐ রকম একটি সাক্ষাৎকারের সময় রমন এফেক্ট-এর আবিষ্কর্তাকে তাঁর আবিষ্কারের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই বাণী দিয়েছিলেন: 'বিজ্ঞানী হিসাবে স্যর সি ভি. রমন বিজ্ঞান-জগৎকে যা দিয়েছেন তার স্মরণে ও গৌরবে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী একটি আনন্দ-মহোৎসবের আয়োজন করেছেন। সেই উৎসবে কায়িকভাবে উপস্থিত থাকতে না পারলেও আমি সর্বান্তকরণে উদ্যোক্তাদের সাফল্য ও যাঁকে কেন্দ্র করে এই উৎসব তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ভারতের হয়েও রমন আজ বিশ্বের এবং তাঁর আবিষ্কারের উত্তরাধিকার বিশ্বের সকল মানুষের।'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই জয়ন্তী উৎসবে এক বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন আচার্য রমনকে। তাতে বলা হয়েছিল: 'আচার্য রমন কেবলমাত্র বিজ্ঞানপ্রেমিক নন, তিনি মানবপ্রেমিক। মানবপ্রেমিক বিজ্ঞানী হিসাবে আইনস্টাইনের পাশেই তাঁর স্থান। তিনি বিশ্বের, গৌরব ভারতের গর্ব।'

॥ পাঁচ ॥

রমনের জীবনের প্রধান ঘটনা তাঁর আবিষ্কৃত রমন এফেক্ট বা রমন প্রভাব।

এই আবিষ্কারের নেপথ্য ইতিহাস এর আবিষ্কর্তা নিজেই বলেছেন। আবিষ্কারের চল্লিশ বছর পরে তিনি লিপিবদ্ধ করেন কৌতূহলোদ্দীপক এই কাহিনী।

'সীল-করা ছোট ছোট টিউবের মার্কারি আলোর সাহায্যে কাজ করতে করতে আমি লক্ষ্য করতাম এক-রঙা আলোর উজ্জ্বল উদ্ভাসন। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে আমি ঠিক করলাম যে, এরই সাহায্যে আলোক-বিক্ষেপণের ক্ষেত্রে আরো গবেষণার কাজ চালিয়ে যাব। এই বিষয়ে আমি যে সফলতা লাভ করেছিলাম তা খুবই সন্তোষজনক ছিল। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ফল পেয়েছিলাম যা এই জাতীয় পরীক্ষায় সচরাচর ঘটে না। সূর্যের আলোর সাহায্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছিলাম যে অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করতে হয় এবং অনেক সময় তা খুবই ক্লান্তিকর মনে হতো। তারপর যন্ত্র খাটিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে মার্কারি বাল্‌বের আলো অনেক বস্তুর ভিতর দিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়। একটি বিশেষ যন্ত্রের (spectroscope) সাহায্যে সেই আলোককে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসার সময় বহুবিধ

বস্তুর সঙ্গে তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বরফের টুকরো দেখতে পেলাম। তখন বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালির মধ্যে স্থানচ্যুত বহু রেখা দেখতে পাওয়া গেল। তারপর পরীক্ষা চালাই বিশুদ্ধ জলের সাহায্যে। তারপর আলোক-চিত্রের সাহায্যে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত রহস্যকে ধরে রাখলাম। বিজ্ঞান-জগতে সেই রহস্য আজ রমন এফেক্ট নামে পরিচিত।'

তোমরা হয়ত ভাবছ, এত বড়ো একটা আবিষ্কার করতে গিয়ে রমনকে বুঝি অনেক রকম দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে, এজন্য তিনি মাত্র তিনটি জিনিস ব্যবহার করেছিলেন, যথা—একটি মার্কারি[1] ল্যাম্প, এক বোতল বেনজিন আর একটি ছোট্ট আলোকবীক্ষণ যন্ত্র (spectroscope), আর সেসব যন্ত্র ছিল মামুলি। সে ধরনের যন্ত্র পৃথিবীর সকল পরীক্ষাগারেই পাওয়া যেত। রমন এই মনে করে গর্ববোধ করতেন যে তাঁর গবেষণার জন্য তাঁকে কোন দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়নি। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন ঃ বিজ্ঞানের মূল কথা হলো স্বাধীন চিন্তা এবং কঠিন পরিশ্রম, যন্ত্রপাতি নয়। আমি যখন নোবেল প্রাইজ পেলাম, তখন যন্ত্রপাতির জন্য আমাকে দুশো টাকার বেশি খরচ করতে হয়নি।

আবিষ্কারের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, সব স্মরণীয় আবিষ্ক্রিয়াই দেখতে অবিশ্বাস্যভাবে সহজ মনে হয়, তবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে তার পেছনে আছে একনিষ্ঠ শ্রম আর সুগভীর চিন্তা।

রমন অবশেষে চিরকালের মতো কলকাতা ত্যাগ করে বাঙ্গালোর চলে গেলেন সেখানকার ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থার (Indian Institute of Science) সঞ্চালকের (Director) চাকরি নিয়ে। নতুন জায়গা, মনোরম পরিবেশ। ভারতে যে কয়েকটি মনোরম শহর আছে বাঙ্গালোর তার মধ্যে একটি। এখানকার জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ।

১। Mercury-পারদ, পারা।

এই পরিবর্তনটা তাঁর নিজের কাছেও খুব ভালো লেগেছিল। একাদিক্রমে পঁচিশ বছর কাল তিনি জনাকীর্ণ কলকাতায় কাটিয়েছেন ; এমন কি মহানগরীর যে অঞ্চলটিতে তিনি বাস করতেন সেটাও ছিল তেমনি জনাকীর্ণ। ১৯৩৩ সাল থেকে বাঙ্গালোর-কেই তিনি করেছিলেন তাঁর স্থায়ী বাসস্থান। এমন কি ইনস্টিট্যুটের কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল এই পুষ্পোদ্যান নগরীতেই বাস করেছিলেন। এখানকার মনোরম পরিবেশের কথা তিনি প্রায়ই বলতেন আর শেষ জীবনে তিনি এই শহরের বাইরে বড় একটা যেতে চাইতেন না।

রমন ছিলেন মনে-প্রাণে একজন বিজ্ঞানসাধক ; তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল একনিষ্ঠ গবেষণা আর অধ্যাপনাকে কেন্দ্র করে। তাই যখন তাঁকে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স-এর ডিরেক্টরের পদে নিয়োগ করা হয় তখন তাঁর মনে এই আশঙ্কা হয়েছিল যে প্রশাসনিক দায়িত্ব তিনি বোধ হয় ঠিকমতো বহন করতে পারবেন না। আগেই বলা হয়েছে এখানে পূর্বে পদার্থবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না ; তিনি এখানে যোগদান করার পর এই বিভাগটি খোলা হয়। তারপর প্রশাসনিক বিষয় সম্পর্কে যখন ইনস্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রমনের মতদ্বৈধ দেখা দিল তখন তিনি ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক রূপে কাজ করতে থাকেন ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই সংস্থার সঙ্গে রমনের সম্পর্ক খুব প্রীতিপ্রদ ছিল না। কর্তৃপক্ষ যে আশা নিয়ে তাঁকে এখানে প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর করে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সেই প্রত্যাশা সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ হয়নি। অন্যদিকে যাঁরা এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের কার্যকলাপ ও মনোভাব এবং পরবর্তী ঘটনাবলী রমনের মনে এমন তিক্তভাবের সঞ্চার করেছিল যে তিনি তা চিরকাল মনে রেখেছিলেন। সেই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলতেন : বিজ্ঞানীকে

যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়া হয়, যদি তার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয় তাহলে তাঁর কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে পারে না। আমার বাঙ্গালোর জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমি কখনো ভুলতে পারিনি।' কিন্তু এর একটা উজ্জ্বল দিকও ছিল। বাঙ্গালোরে এসে তিনি তাঁর সমস্ত সময় পদার্থবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। যে পনের বছর তিনি ইনস্টিট্যুটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে তিনি বহু তরুণ বৈজ্ঞানিককে এইখানে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং তাদের সকলকেই তিনি গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এরই ফলে, আগেই উল্লিখিত হয়েছে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে পদার্থবিজ্ঞানে এক নবীন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। তিনি একদল প্রথমশ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানী তৈরি করেছিলেন যাঁরা দেশের অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আচার্য হিসাবে রমনের এই কৃতিত্ব আমাদের মনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রমন যখন ইনস্টিট্যুটের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর হয়ে এলেন তখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে বললেই হয়—তখন তিনি তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাই তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষটা যখনই প্রকাশ্যে দেখা দিত তখনই সাধারণের কাছে প্রতীয়মান হতো যে সেই সংঘর্ষের এক প্রান্তে ছিল একটি সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তির মহত্ত্ব আর অপর প্রান্তে ছিল প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থ। এই রকম সংঘর্ষ সমাধান করা কঠিন ছিল এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছিল আচার্য রমনের মানসিক তিক্ততা।

এইবার বলি বাঙ্গালোর ইনস্টিট্যুটে যোগদান করার অব্যবহিত কাল পরে গুরুত্বপূর্ণ কি গবেষণায় রমন হাত দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে রমনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল পদার্থ বিজ্ঞানের দুটি ক্ষেত্রে, যথা—আলোকবিজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞান। এই দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে স্বীকৃতি

পেয়েছে। দ্রুত প্রকম্পিত শব্দ-তরঙ্গ সাহায্যে আলোকের বিক্ষেপণ সম্পর্কে য়ুরোপ ও আমেরিকায় এর আগে যে কয়জন বিজ্ঞানী গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্রিল্‌লোইন, ডেবি, সিয়র্সে, লুকাস ও বিকার্ডের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সাল থেকে পদার্থবিজ্ঞানের এই দুরূহ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে। কিন্তু তাঁদের কেউই এই বিষয়ে চূড়ান্তভাবে সফলতা লাভ করতে পারেন না, এমন কি তাঁদের কারো কারো মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গিয়েছিল। ১৯৩২ সালের পর যখন তাঁদের এই গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রকাশিত হয় তখনই বিজ্ঞান জগতে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধের কথাটা জানতে পারা যায়।

বহুবিধ সূত্র বা Theory পাওয়া গেল এই চিত্তাকর্ষক বিষয়টি সম্পর্কে সেইসব সূত্র অবলম্বন করে ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে গবেষণা। কিন্তু সেইসব গবেষণালব্ধ তথ্যকে কোন একটি থিওরির সঙ্গে সংযুক্ত করা গেল না। গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এইরকমই ঘটে থাকে—থিওরি একদিকে চলে, আর তারই সমান্তরালভাবে চলে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment)। গবেষণালব্ধ তথ্যদ্বারা কোন একটি থিওরিকে প্রমাণ করা যায় না, যদিও তা অংশত সত্য হতে পারে। একদিন বিষয়টি নিয়ে আকস্মিকভাবে আলোচনা করতে গিয়ে রমন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমস্যাটির মূলে প্রবেশ করলেন, নিজেই কয়েকটি প্রশ্ন তুললেন এবং এমন একটি পন্থার নির্দেশ করলেন যার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। এর পরেই তাঁরই এক সহকারী নগেন্দ্রনাথের সহায়তার লেখা হয় কয়েকটি প্রবন্ধ এবং এখন পদার্থবিজ্ঞানে যাকে বলা হয় 'রমন-নাথ থিওরি অব ডিফ্রাকশান অব লাইট বাই আলট্রাসোনিক ওয়েভস,' সেই সূত্রটি উদ্ভাবিত হয়। বহু সম্ভাবনাপূর্ণ এই রমন-নাথ সূত্র পরে পৃথিবীর একাধিক ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হয়। এই সমস্যাটির

সমাধান করতে গিয়ে, তাঁর সতীর্থদের মধ্যে অনেকেই রমনের গবেষণার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথমে একটা গাণিতিক যুক্তির ওপর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে তারপর সেটিকে হাতে-কলমে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু অধ্যাপক রমন এই ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটি করেছিলেনঃ অর্থাৎ তিনি আগে প্রাধান্য দিলেন হাতে-কলমে পরীক্ষা করার বিষয়টিকে এবং গাণিতিক যুক্তি সেই পরীক্ষালব্ধ ফলকে অনুসরণ করল। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আমার সকল সূত্র প্রথমে জন্ম নিয়েছে পরীক্ষাগারে ; তার গাণিতিক যুক্তিটা দেখা দিয়েছে সেই গবেষণালব্ধ ফলকে অবলম্বন করে এবং এর দ্বারা আমি বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করেছি।' এইভাবে আলোক বিজ্ঞানে ও শব্দ বিজ্ঞানে তিনি যে যুগান্তর এনেছিলেন সে সম্পর্কে তোমরা বড়ো হয়ে আরো অনেক জানতে পারবে। আর জানতে পারবে এই গবেষণা দ্বারা আচার্য রমন ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে বিশ্বের বিজ্ঞান সভায় কিরকম মর্যাদার সঙ্গে স্থাপিত করেছিলেন।

ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিট্যুটে থাকবার সময়ে রমন আর একটি গবেষণার কাজে হাত দিয়েছিলেন। সেটি হলো বিশেষ ধরনের রঞ্জন-রশ্মির (x-ray) প্রতিফলন। একদিন তিনি তাঁর ল্যাবোরে-টরিতে কাজ করবার সময় লক্ষ্য করলেন যে, রঞ্জন-রশ্মির একটি কিরণ হীরকের পাত্র দিয়ে যখন যায় তখন আট-কোণা সেই স্ফটিক স্বচ্ছ আধারটির মধ্যে দেখা যায় এক-রঙা রঞ্জন-রশ্মির কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রতিবিম্বন। এর থেকে এক্স-রে সম্পর্কে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং এর মধ্যে এক রকম নতুন শক্তির আভাস পাওয়া যায়। পদার্থবিজ্ঞানের একটা নতুন দিকের সূচনা হয় যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। গবেষণার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সময়ে ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিট্যুটে এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যে নবীন গবেষক গোষ্ঠী তখন এখানে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে দক্ষিণ ভারতের একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে তাঁদের আচার্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ইনস্টিট্যুটে কর্মনিরত অধ্যাপক রমনের একটি সুন্দর চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'১৯৪০ সালে আমি যখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম. এস-সি পাশ করে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানে একজন গবেষক হিসাবে যোগদান করি তখন আমি আচার্য রমনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করি। তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বছর। সেই বয়সে তাঁর মধ্যে যৌবনোচিত উদ্যম দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। আঠার বছর বয়স থেকে যে মন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ ছিল, যে মন গবেষণায় উৎসাহ বোধ করেছে, আমরা দেখলাম সেই বাহান্ন বছর বয়সেও সেই মন গবেষণাগারে গবেষণার কাজে একাগ্রচিত্তে রত। ঘড়ির কাঁটা ধরে তিনি ইনস্টিট্যুটে আসতেন। তারপর ঘুরে ঘুরে সকলের কাজ দেখতেন। কেউ কোন অসুবিধা বোধ করলে যন্ত্রের সঙ্গে বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে দিতেন ; তারপর তার পিঠ চাপড়িয়ে বলতেন—কাজ করে যাও, একমনে শুধু কাজ করে যাও। তাঁর বিচিত্র কর্মময় জীবন থেকে আমরা সবাই প্রেরণা পেতাম। অধ্যাপক হিসাবেও আচার্য রমনের দক্ষতার কোন তুলনা হয় না।

১৯৪৮ সালে ইনস্টিট্যুটের চাকরি থেকে তিনি অবসর নিলেন। যে পনর বৎসর কাল রমন এখানে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক সংস্থাটির বহুবিধ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার উপযোগী একটি সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরি তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। ত্রিশ বছর আগে তিনি যে সব বিষয়ে গবেষণার সূচনা করে গিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে কর্মনিরত বহু গবেষক সেই ধারায় কাজ চালিয়ে আসছেন। পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ আর নিষ্ঠা তাঁর সময়ে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে

১ অন্ধ্রপ্রদেশ আকাদেমি অব সায়েন্স জার্নাল ; ১৯৬০

একটি নতুন রূপ দিয়েছিল বললেই হয়। তাঁকে কেন্দ্র করেই তো ভারত তথা ভারতের বাইরে সেদিন ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিট্যুটের সুনাম ব্যাপ্ত হয়েছিল। অধ্যাপকের জীবনে এ বড়ো কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না।

তাঁর ব্যাঙ্গালোর জীবনের আর একটি কীর্তির কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটি হলো ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ বা 'দি ইণ্ডিয়ান আকাদেমি অব সায়েন্স'। আচার্য রমনই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ব্যাঙ্গালোরে আসার অব্যবহিতকাল পরেই তিনি এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেথাকেন এবং ১৯৩৪ সালে তাঁর পরিকল্পনা রূপ নিলো। এই একই সময়ে উত্তর প্রদেশে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান ছিলেন মেঘনাদ সাহা। তিনিও এই সময়ে বিজ্ঞানচর্চার জন্য এই রকম একটি আকাদেমি স্থাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। যে সব বিজ্ঞানী তখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে গবেষণায় রত ছিলেন সেইসব উৎসাহী গবেষকদের রমন এই আকাদেমিতে যোগদান করার জন্য আহ্বান করলেন। যাঁরা শুরুতেই যোগদান করেন তাঁরা সবাই আকাদেমির ফেলো (Fellow) হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রমন ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নএবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর সভাপতি।

ব্যাঙ্গালোরই আকাদেমির প্রধান দপ্তর হিসাবে নির্বাচিত হয়। যে বছর এটি স্থাপিত হয় সেই বছরেই আকাদেমির কার্যবিবরণী দুইটি পৃথক ভাগে প্রকাশিত হয় ; তার একটি হলো পদার্থবিজ্ঞান আর অপরটি জীববিজ্ঞান। সেই থেকে এই কার্যবিবরণী নিয়মিত-ভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়ে আসছে। যারা গবেষণা করতেন তাঁদেরই গবেষণার ফলাফল এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। যে পঁয়ত্রিশ বছর রমন এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সভাপতি হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে আকাদেমির কার্যবিবরণী যে রকম নিয়মিত ভাবে মাসের পর মাস প্রকাশিত হতো, ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক পত্র-

পত্রিকার ইতিহাসে আর কোন তুলনাই মেলে না। আকাদেমির মুখপত্রটি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সেদিকে রমন বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং এজন্য তাঁকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিতে হতো। ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় বহন করে যে পত্রিকা য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থায় যাবে, তার মান যাতে উঁচু থাকে সেজন্য আকাদেমির সভাপতির চিন্তা ভাবনার যেন অন্ত ছিল না।

এইখানেই বিজ্ঞানসাধক রমনের কৃতিত্ব।

বিগত ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের সময়ে ভারতে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় তাকে সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একা একটি মানুষ। তিনি স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। এই বিজ্ঞান পরিষদকে কেন্দ্র করে সেদিন তাঁর যে মূর্তি দেখা গিয়েছিল তা একজন প্রকৃত আচার্যের মূর্তি। একদা তরুণ ভারতীয় গবেষকদের সামনে ছিল ঠিক এই রকম একজন আচার্যের মূর্তি। তিনি স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। বস্তুত কলকাতায় জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করেন তখন থেকেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, আচার্য রমনের সময়ে তার বিস্তার ছিল আরও বর্ণাঢ্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্যাঙ্গালোরে যখন ইণ্ডিয়ান আকাদেমি অব সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন এর উদ্বোধনী ভাষণে রমন সকলের আগে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

'আমি কলকাতায় আমার কর্মজীবনের শুরুতে যে বৈজ্ঞানিক সংস্থাটির সংস্পর্শে এসেছিলাম সেই 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে'র প্রতিষ্ঠাতার কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারই তো এদেশে বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ। এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ আমরা সেই রকম একটি প্রতিষ্ঠান চাই যা লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিট্যুশন অথবা ব্রিটিশ এ্যাসোশিয়েশন ফর দি

অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের সমতুল্য হবে। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে এমন একটি প্রতিষ্ঠানই দরকার যেখানে শুধু বিজ্ঞান সম্পর্কিত বক্তৃতাই দেওয়া হবে না, বক্তৃতার বিষয়গুলিকে শ্রোতাদের হাতে-কলমে করে দেখিয়ে দেওয়া হবে। ডাক্তার সরকারের এই মূল্যবান কথাগুলির পুনরুক্তি করে আমি আকাদেমির উদ্বোধন করছি।'

আমাদের দেশে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় পাঠাতেন। এই চিরাচরিত প্রথা ভাঙবার জন্য রমন তখন নিজে তাঁর প্রবন্ধগুলি আকাদেমির মুখপত্রে ছাপতে লাগলেন ও আকাদেমির সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য তরুণ গবেষকদের বললেন, "বিদেশের পত্রিকায় প্রবন্ধ না পাঠিয়ে তোমাদের নিজস্ব পত্রিকাতেই ছাপো—এতে আকাদেমির গৌরব বৃদ্ধি পাবে আর তোমাদেরও সুনাম হবে এবং সকলের ওপর তোমাদের জন্মভূমি ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।" এর ফলে আকাদেমির মুখপত্রটির প্রচার ভারতের বাইরে খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর এই প্রয়াসের ফল বিজ্ঞানজগতে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

আকাদেমি যখন স্থাপিত হয় তখন এর লক্ষ্য বা motto কি হবে সেই কথা জিজ্ঞাসা করায় রমন বলেছিলেন, 'জাতির সেবা হবে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। আমরা এখন বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে বাস করছি এবং এই বিষয়ে ভারতবাসী যে এখন বিলক্ষণ সচেতন হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতির মধ্যে পাশাপাশি দুটি আপাত প্রতীয়মান বিরুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে, আমাদের দেশে সঞ্চিত আছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী অপর্যাপ্ত মালমশলা যার অস্তিত্ব সম্পর্কে দু'চারজন বিশেষজ্ঞ ব্যতীত আর কেউ অবহিত নন, অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক জ্ঞানের মূলগত যে আদর্শ তার সঙ্গে চলেছে বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ের একটা বিরাট প্রক্রিয়া।

আমরা যেন কখনো একথা বিস্মৃত না হই যে, প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান হলো একটি জাতির বিরাট জমিদারি এবং তাকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিভক্ত করে তার ওপর কোন সীমানা টেনে দেওয়া নিতান্তই কৃত্রিম। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বার বার এই কথাটি প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সব কৃত্রিম সীমানার বাইরে গিয়েই সত্যিকারের প্রগতি সম্ভব বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের ফলাফল কোন জাতির একক সম্পত্তি নয়—এ হলো সার্বজনীন। বিশ্বমানবের কল্যাণসাধন বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আদর্শ। এই আদর্শকে সামনে রেখে দেশের সেবা করা হবে এই আকাদেমির লক্ষ্য। যাঁরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানের অধিকারী তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি করাই হবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।'

এ যেন আচার্য রমনের কণ্ঠে তাঁরই পূর্বসূরি আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথা।

॥ ছয় ॥

এইবার বলব রমনের অক্ষয় কীর্তি—রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের কথা। কলকাতায় বসু-বিজ্ঞানমন্দির যেমন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর অক্ষয়কীর্তি, বাঙ্গালোরে তেমনি রমন গবেষণা কেন্দ্রটি বিজ্ঞান সাধক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের জীবনের এক গৌরব স্তম্ভ। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ যখন আসন্ন হয়ে উঠল তখন থেকেই তিনি বাঙ্গালোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাঁর মতো একজন বিজ্ঞানীর জীবনে অবসর সুখ ভোগ করা রমনের চিন্তার বাইরে ছিল। তাই চাকরি থেকে অবসর নেওয়া যত নিকটবর্তী হতে থাকে ততই তিনি চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি গবেষণার কাজে অতিবাহিত করবেন। তাঁর সেই চিন্তার পরিণতি হলো রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুট। এটি তাঁর নিজস্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

রমনের পরামর্শক্রমে মহীশূর সরকার ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমিকে ব্যাঙ্গালোরের উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত এক খণ্ড জমি দান করেন। জমি পাওয়ার পর তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে বেরুলেন অর্থ সংগ্রহের আশায়, একটি মোটামুটি ভবন তৈরি হতে পারে সেই পরিমাণ অর্থই তিনি চেয়েছিলেন। বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার কালে জগদীশচন্দ্রকেও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে

হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যোৎসাহী লোকদের কাছ থেকে এবং তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। তবে এই অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁকে ঘুরতে হয়নি, কলকাতায় বসেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। রমন অর্থ সংগ্রহের জন্য যখন যে অঞ্চলে গেছেন সেখানেই অপরিমিত দানে তাঁর পাত্র পূর্ণ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ওপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করছে এই কথাটা বোঝাতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

১৯৪৩ সালে ইনস্টিট্যুটের বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয় এবং ছ'বছর পরে ১৯৪৮ সালে নির্মাণকার্য শেষ হয়। ১৯৪৯ সালে, স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় বৎসরে, রমন এর উদ্বোধন করেন। তাঁকেই ডিরেক্টর করে ও দশ বারোজন গবেষককে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইনস্টিট্যুটের কাজ আরম্ভ হয় ঐ বছর থেকেই। এই গবেষণা সংস্থাটির জন্য রমনের নিজের দানের পরিমাণ বড় কম ছিল না। তিনি নগদ টাকা, কোম্পানির কাগজ ছাড়া তাঁর মূল্যবান লাইব্রেরিটিও এই সংস্থাকে দান করেন। তাঁর এই ব্যক্তিগত দানের পরিমাণ ছিল প্রায় একলক্ষ টাকা। এসবই তিনি নিঃশর্ত দান করেছিলেন।

ব্যাঙ্গালোরের উচ্চ ভূখণ্ডে এক মনোরম পরিবেশে স্থাপিত রমন রিসার্চ ইনাস্টিট্যুট একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। বসু-বিজ্ঞান মন্দির যেমন জগদীশচন্দ্রের স্মৃতিকে বহন করছে, রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুটও তেমনি এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালকের স্মৃতিকে বহন করছে। ইনস্টিট্যুটের দ্বিতলে আছে মিউজিয়ম, লাইব্রেরি ও বক্তৃতা গৃহ। একতলায় আছে গবেষণার জন্য কয়েকটি ল্যাবোরেটরি, অধ্যয়ন কক্ষ ও সংস্থার ডিরেক্টরের অফিস। ইনস্টিট্যুটের, যাদুঘরটির সংগ্রহ খুবই মূল্যবান। এর সমস্ত সংগ্রহ রমনের নিজস্ব ; এখানে আছে বহু রকমের খনিজ পদার্থ, ক্রিস্টাল, পাখি. প্রজাপতি, শিলীভূত দ্রব্য (fossil) এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে প্রয়োজনীয় বহু রকমের জিনিস। প্রাকৃতিক দ্রব্য সম্পর্কে রমনের কী অপরিসীম আগ্রহ ছিল তা বোঝা যায় মিউজিয়মটি তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়ালে। বিজ্ঞানী রমন প্রকৃতপক্ষে

ছিলেন একজন খুব বড় প্রকৃতিবিজ্ঞানী (Naturalist) ; তিনি তাঁর ছাত্র ও তরুণ গবেষকদের প্রায়ই বলতেন—প্রকৃতিকে বুঝতে পারাই হলো বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য।

বৈজ্ঞানিক রমনকে বলা হতো প্রকৃতির সন্তান। কারণ তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে প্রকৃতির কার্যাবলী বুঝবার ও তার গোপন রহস্য জানবার চেষ্টা করতেন। তাঁর আয়ত চোখ দুটির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সর্বদাই যেন প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিবদ্ধ থাকত। রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের সর্বাঙ্গে আছে রমনের নিপুণ হাতের ছাপ আর একটি পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয়। এর মধ্যে চলা-ফেরার পথগুলি তাঁরই সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী তৈরি হয়েছে। ফুলের বাগান আর সেই বাগানের মধ্যে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাশ গাছের শ্রেণী দেখলে রমনের শিল্পরুচির প্রশংসা না করে উপায় নেই। একটি আদর্শ গবেষণা সংস্থা হিসাবে এটিকে গড়ে তোলার জন্য তাঁর যেন চেষ্টা ও যত্নের বিরাম ছিল না। এখানে যারা গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকবে তাদের কাজের যাতে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে রমনের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ইনস্টিট্যুটের ফটকে বিলম্বিত একটি সাইনবোর্ড বহিরাগত দর্শকদের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করত। সেই সাইনবোর্ডে লেখা আছে : আমরা এখানে কাজ করছি (WE ARE WORKING HERE) এবং এই চারটি শব্দ যেন নিঃশব্দে সকলকে সতর্ক করে দিত যাতে কেউ ভেতরে ঢুকে অযথা কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটায়।

গবেষণার জন্য একটি আদর্শ সংস্থা কি করে গড়ে তুলতে হয় সে বিষয়ে রমনের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল। য়ুরোপে তিনি এই জাতীয় বহু প্রতিষ্ঠান স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের কল্পনা মিলিয়ে তৈরি হয়েছে রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুট। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত, কেমন করে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং ঠিক কী ধরনের লোক এখানে নিযুক্ত হবে—এসব বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণা খুবই স্বচ্ছ ছিল। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে

এই সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত হলো :

'১৯৪৮ সালে রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুট প্রতিষ্ঠানটি আমি সৃষ্টি করেছিলাম। যে অনুকূল পরিবেশে বিশুদ্ধ গবেষণা সম্ভব এবং বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক সংস্থায় যে পরিবেশের অভাব, ঠিক সেই রকম পরিবেশে আমার গবেষণার কাজ এখানে নির্বিঘ্নে করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানের সাধনা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। এই প্রতিষ্ঠানে আমি ঠিক সেই আশ্রয় পেয়েছি যেখানে আমার ব্যক্তিগত গবেষণার কাজ আমি চালাতে পারি। অবশ্য আমার পরে প্রতিষ্ঠানের এই ব্যক্তিগত রূপটা বদলিয়ে যাবে এবং তখন এই প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের একটি বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হবে ও বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখায় এখানে গবেষণা চলবে! ভারতের সকল প্রদেশ থেকে ও ভারতের বাইরে থেকেও বিজ্ঞানীরা এই রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গবেষণার জন্য এখানে আসবেন।

'আমি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি যে সেইখানেই বিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব যেখানে অন্তর থেকে প্রেরণা আসে। বাইরের চাপে এর বিকাশ সম্ভব নয়। সেইজন্যই আমি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য গ্রহণ করি না। আমি জানি রীতিমত তহবিল (Fund) ব্যতিরেকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তাইতো আমি আমার যথাসর্বস্ব এই প্রতিষ্ঠানকে দান করেছি। হয়ত প্রতিষ্ঠানের বিকাশের পক্ষে এই দান যথেষ্ট নয়, তবু আমি আশা করব, আমার দেশবাসী এটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন।'

রমন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কি রকম ভালবাসতেন তার একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করি। একবার খবরের কাগজে একটা সংবাদ বেরুলো যে রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুট রমনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের ডেকে, তার ল্যাবোরেটরির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন : 'আমার অহঙ্কারের কীর্তিস্তম্ভ এই

ইনস্টিট্যুট। আমি সত্যি একজন অহঙ্কারী ব্যক্তি এবং মিশরের রাজারা যেমন তাদের মৃত্যুর পূর্বে পিরামিড তৈরি করতেন, ঠিক তেমনি আমার পিরামিড এই প্রতিষ্ঠান। যাট বছর বয়সে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স থেকে আমার অবসর নেওয়ার কথা ছিল। তাই তার ছবছর আগে থেকেই আমি এই প্রতিষ্ঠানের ভবন তৈরির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম, যাতে করে যেদিন চাকরি থেকে অবসর নেব সেইদিনই আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে সোজা এখানে চলে আসতে পারি। একটি দিনের জন্যও আমি অলস থাকতে পারি না।

এই হলেন বিজ্ঞানসাধক রমন এবং এই জন্যই তো তিনি তৈরি করেছিলেন রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুট। তাঁর জীবনের বাকী বিশ বছর প্রতিদিন তাঁকে সবাই দেখেছে এইখানে কর্মনিরত থাকতে একাগ্র মনে ও নিরলসভাবে। বিজ্ঞানীর জীবন নিরবচ্ছিন্ন কর্মের জীবন। আচার্য রমন ছিলেন এরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিবিধ মণিরত্ন, বিশেষ করে হীরক সম্পর্কে রমনের খুব আগ্রহ ছিল। বৈদূর্য, অয়স্কান্ত, চুনি, পান্না ও নানা প্রকার হীরক নিয়ে তিনি তাঁর ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষা করতেন। এইসব জিনিসের সংগ্রহও ছিল তাঁর প্রচুর। তাঁর রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে তিনি যে যাদুঘরটি তৈরি করেছিলেন সেখানে এমন কতকগুলি অমূল্য মণিরত্ন আর কিছু খনিজদ্রব্য সংরক্ষিত আছে যা গবেষণার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে হীরক (diamond)এর গুণাগুণ, এর গঠন সম্পর্কে তিনি ১৯৩০ সাল থেকে গবেষণা করেছেন। তখন তাঁর 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কৃত হয়েছে। হীরক সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল সম্পর্কে একটা গল্প আছে।

তাঁর ছোট ভাই রামস্বামীর বিয়েতে যোগদান করতে রমন কলকাতা থেকে বাড়ি এলেন। বরবেশে সজ্জিত কনিষ্ঠের ডান হাতের একটি আঙ্গুলে হীরে-বসানো একটি আংটি দেখতে পেলেন। সেই হীরকখণ্ড থেকে ঠিকরে পড়া উজ্জ্বল আভা বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বিয়ের উৎসব শেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে হীরে বসানো সেই আংটিটা চেয়ে নিলেন এবং তার বদলে

ভাইকে পান্নার একটা দামী আংটি দিলেন। তাঁর পরীক্ষা হয়ে গেলে পরে অবশ্য আংটিটি তিনি ভাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রমন কলকাতায় এসে তাঁর ল্যাবোরেটরিতে সেই আংটির মধ্যেকার হীরকখণ্ড নিয়ে গভীরভাবে পরীক্ষা করতে থাকেন। তাঁর এক ছাত্র অধ্যাপকের এই কৌতূহল দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে 'স্যর, এর মধ্যে কি কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন?'

—হ্যাঁ। আগে আমার পরীক্ষা শেষ হবে, তখন বলব।

তারপর দশ বছর ধরে তিনি হীরক নিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ল্যাবোরেটরিতে দিনের পর দিন চালিয়েছিলেন এবং সেইসব পরীক্ষার ফলে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তা দেখে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা রীতিমত বিস্মিত হলেন। প্রতিভার নিয়মই এই—কোন একটি বিষয়ে সে কখনো নিবদ্ধ থাকে না, তার সন্ধানী চক্ষু দিয়ে সে সব কিছু দেখতে চায়, জানতে চায়। আবিষ্কারের ইতিহাসে প্রতিভা সম্পর্কে তাই কত কাহিনী। সেই থেকে, হীরা ও অন্যান্য মণিরত্ন কেনা তাঁর বাতিক হলো। নীলাম থেকে ব্যক্তিগত বিক্রেতার কাছ থেকে বিশেষ পরীক্ষার জন্য তিনি এইসব জিনিস কিনতেন। তাঁর রমন রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের মিউজিয়মে হীরে ও অন্যান্য রত্নের যে সংগ্রহ আছে তা পৃথিবীর কোন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক ল্যাবোরেটরিতে নেই। এই হীরেই আছে কয়েক শত।

রমন ছিলেন একজন পদার্থবিজ্ঞানী। কিন্তু তাই বলে তিনি শুধু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে হীরক সম্পর্কে গবেষণা করতেন না। এই বিষয়ে তাঁর আগ্রহটা যতখানি বৈজ্ঞানিক ছিল ঠিক ততখানি ছিল নান্দনিক (aesthetic)। এই সম্পর্কে তাঁর নিজের রচনা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো: 'হীরক হলো বিশিষ্ট স্ফটিক (cri-tal) জাতীয় দ্রব্য এবং ইহা রাসায়নিক পদার্থ। আমি সাতশো রকম হীরক সংগ্রহ করে, এদের গঠন আকৃতি, প্রকৃতি পরীক্ষা করে দেখেছি। কতকগুলি হীরক চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট আর কতকগুলি আটকোণ বিশিষ্ট। আলট্রা-ভায়োলেট আলোক-

পাতের ফলে চারকোণা হীরে থেকে উজ্জ্বল নীল বর্ণের আভা নির্গত হয়। তাঁর সংগৃহীত হীরেগুলোর মধ্যে এই প্রকার এমন একটি হীরে আছে যার প্রতিফলিত আলোকদ্বারা অন্ধকার ঘরে অনায়াসে একটি খবরের কাগজ পাঠ করা যায়। আর যেগুলো আটকোণা তাদের মধ্যে এই জাতীয় কোন গুণ বিদ্যমান নেই। উজ্জ্বলতা (Luminiscence) হীরকের নিজস্ব একটি গুণ (property)—হীরে থেকে যে আলো ঠিকরে বেরুতে দেখা যায় তা হীরেরই নিজস্ব প্রকৃতি, এর মধ্যে সংরক্ষিত বাইরের কোন পদার্থের জন্য নয়।

এক হিসাবে রমনকে স্ফটিক-বিজ্ঞানের (crystal physics) প্রবর্তক বলা চলে। হীরে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি বিখ্যাত হীরে পাওয়া গিয়েছিল যা ভারতের বাইরে চলে গিয়ে এদের খ্যাতি বিস্তার করেছিল। মধ্য ভারতে হীরকের অন্যতম স্থান পান্নারাজ্য থেকে তিনি কতকগুলি মূল্যবান হীরক সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি বলতেন 'পান্নায় যে শ্রেণীর হীরক পাওয়া যায় তা কি উজ্জ্বলতায়, কি গঠন পারিপাট্যে অতুলনীয়। তাঁর মৃত্যুর দুবছর আগে রমন আর একটি কাজে হাত দিয়েছিলেন। সেটি হলো কৃষ্ণা উপত্যকা এবং এর মধ্য দিয়ে ও এর আশপাশ দিয়ে যেসব নদী প্রবাহিত হয়েছে তার ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা। অতীতকালে প্রায় ষাট হাজার লোক এই অঞ্চলে সন্ধানে নিযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে তাঁর লেখা 'কৃষ্ণা উপত্যকার হীরক' শীর্ষক একটি সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটি লিখবার আগে তিনি এই সম্পর্কে যেসব ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা বলেন যে, আচার্য রমন যখন যে কোন বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছেন তার মধ্যে থাকে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয়। সব কিছু তিনি তন্ন তন্ন করে বুঝতে চাইতেন। বিজ্ঞান সাধক রমনের কৃতিত্ব এইখানেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃস্ট্যালোগ্রাফী কংগ্রেসে তিনি সক্রিয়

ভূমিকা নেন। এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (ডিসেম্বর ১৯৭০) পত্রিকা অধ্যাপক রমনের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে বলেছিল : "নীরস পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ব্যাপৃত থাকলেও প্রফেসার রমনের সৌন্দর্যস্পৃহা ও রসবোধও কম ছিল না। সঙ্গীত যন্ত্র, আলোক তরঙ্গের বিচিত্র অভিব্যক্তি, সমুদ্রের রং পাখীর পালকের বর্ণ বৈচিত্র্য শামুক ঝিনুকের খোলার রামধনুর রং স্ফটিকের কম্পন, বিশেষ করে ফ্লোরেসেন্স, ফসফোরেসেন্স প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত হীরকের গঠন, আণবিক সংস্থান ও সৌসাদৃশ্য বিষয়ে বিবিধ গবেষণার মধ্যেও তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্স-রশ্মির ডিফ্র্যাক্‌শন এবং ফুলের রং সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। প্রফেসার রমন এবং তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করলেও মূলত সেগুলি আলোক বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন দিক মাত্র। ক্রস্ট্যাল ফিজিক্স, বিশেষতঃ ডায়মণ্ড ফিজিক্সের উপর তাঁর অনুরাগ ছিল বেশি। বিজ্ঞানী মহলে ডায়মণ্ড ফিজিক্স সম্বন্ধে প্রফেসার রমন ছিলেন একজন অবিসম্বাদী বিশেষজ্ঞ।"

আমরা দেখেছি ছাত্রজীবন থেকে প্রবীণ বয়স অবধি তিনি নানা রকম পুরস্কার ও সম্মান অর্জন করেছেন। নোবেল পুরস্কারই তাঁর জীবনের একমাত্র সম্মান ছিল না। বিশ্বের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সংস্থা রমনকে সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। যেমন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. এস-সি ডিগ্রী। গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এল. এল. ডি, 'ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক পি. এইচ.-ডি. ডিগ্রি। কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ বানারসী বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সাম্মানিক ডি এস-সি ডিগ্রি প্রদান করেন। এছাড়াও স্বাভাবিক কারণেই তিনি ছিলেন দেশ বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এর মধ্যে গ্লাসগোর রয়েল ফিজিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান অপটিক্যাল সোসাইটি, রাশিয়ান আকাদেমী অব সায়েন্সেস, জুরিখ ফিজিক্যাল সোসাইটি

মিউনিক ডয়েট আকদেমী, হাঙ্গেরিয়ান সায়েন্স আকাদেমীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকরূপে বরণ করেন। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৫৭ সালে তাঁকে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার প্রদান করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'ভারতরত্ন' উপাধি ও পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

রমন সত্যিই ভারতরত্ন। একষট্টি বছর বয়সে জাতীয় অধ্যাপক-রূপে তিনি যৌবনোচিত উৎসাহ নিয়ে যেভাবে গবেষণারত ছিলেন তা দেখে সবাই বিস্মিত হতেন। আঠার বছর বয়স থেকে যে মন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ বোধ করেছে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই মন তাঁর ব্যাঙ্গালোরের রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে গবেষণারত ছিল। বিশ্বের নানা দেশ তাঁকে সম্মানিত করেছে। কিন্তু কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এক অদ্ভুত উদাসী মানুষ রমন। বিজ্ঞান তাঁর সাধনার বিষয়—ভারতের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ছিল তাঁর আজীবনের লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর চিন্তা ছিল বহু ব্যাপ্ত।

বিজ্ঞানী রমন একাধারে ছিলেন দার্শনিক ও মানবিক। আহারে-বিহারে, পরনে-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খাঁটি ভারতীয়—একজন দীপ্ত যোগী। ১৯৭০ সালে বিরাশী বছর বয়সে এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

*বিজ্ঞানী সি. ভি. রমনের গবেষণার সারসংক্ষেপ

...আগে বৈজ্ঞানিকদের একটা ধারণা ছিল যে, কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলো কোনো কঠিন, তরল বা গ্যাসের ওপর এসে পড়লে তা থেকে যে শক্তির বিকিরণ হয় তার কম্পাঙ্ক সব সময়েই আপতিত আলোর কম্পাঙ্কের সমান হয় বা তার কম হয়। শক্তি আর ভর-বেগের নিত্যতার কথা চিন্তা করলে এই ধারণাকে সহজ সত্য বলে মেনে নিতে আপাতদৃষ্টিতে কোনো অসুবিধেই হয় না। কিন্তু গভীর-ভাবে চিন্তা করলে সন্দেহ জাগে মনে। তাহলে মাধ্যমের অণুগুলো নিজস্ব অন্তর্ভুক্ত শক্তির (Inherent energy) কি কোনোই ভূমিকা নেই? এই প্রশ্ন এসে ঘা দিলো তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের মাথায়। শুরু হলো নিরলস গবেষণা। রমন অবশ্য একটু অন্য কোণ থেকে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করেছিলেন। সমুদ্র আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি যেন ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতেন। কেন নীল হলো সমুদ্র আর আকাশ? বিচ্ছুরণের জন্যে? যদি তাই হয়, তবে বিভিন্ন তরল কীভাবে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়? ...আকাশ আর সমুদ্রের নীল রঙ-এর রহস্য উন্মোচনের গবেষণা চালাতে চালাতে হঠাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটে গেলো। বিস্মিত রমন লক্ষ্য করলেন যে, বেঞ্জিন, টলুইন ইত্যাদি জৈব তরলের ওপর নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের এক গুচ্ছ আলো এসে পড়লে ঐ সব তরল থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে ঐ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ছাড়াও উচ্চতর কম্পাঙ্কের আলো উপস্থিত থাকছে। অবশ্য এই ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে ১৯২৩ সালে তাত্ত্বিক দিক থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন স্মেকাল। তাঁর ব্যাখ্যার

---

*"বিজ্ঞান বিচিত্রা" পত্রিকার মে, ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর লেখা "বরণীয় বিজ্ঞানী, স্মরণীয় আবিষ্কার" প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশবিশেষ।

ভিত্তি ছিলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। কিন্তু রমনই প্রথম পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সেই তাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

স্পেক্ট্রোস্কোপ-এ বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গে যে বর্ণালী ধরা পড়লো তাতে আপাতন কম্পাঙ্ক ছাড়াও অন্যান্য কম্পাঙ্কের জন্যে যে সব রঙীন রেখা দেখা গেলো তাদেরকেই পরবর্তীকালে "রমন রেখা" (Raman lines) নামে অভিহিত করা হলো। আর এই সামগ্রিক ঘটনাকে বলা হলো "রামন ক্রিয়া" (Raman effect)। আর এই "রমন এফেক্ট" আবিষ্কার করার জন্যেই ১৯৩০ সালে রমনকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।...

এবার রমন ফিরে তাকালেন সমুদ্র আর আকাশের দিকে। হ্যাঁ, স্বচ্ছ আকাশ আর সমুদ্রের নীল হওয়ার কারণটাও এখন একেবারেই স্বচ্ছ হলো তার কাছে। আকাশের বায়ু আর ধূলোর কণা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে সূর্য কিংবা চাঁদের আলো এসে পড়েছে মাটিতে। যে আলোর কম্পাঙ্ক যত বেশি সেই আলো ততো বেশি বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে। যে সব রঙ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তাদের মধ্যে নীল রঙের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি বলে তার বিচ্ছুরণও হয় সব চাইতে বেশি। তাই আকাশ আমাদের চোখে শুধুই নীল। মহাকাশে কিন্তু বায়ু নেই। তাই সেখানে বিচ্ছুরণও নেই। তাই পৃথিবীর দিনরাত দু'বেলাই মহাকাশ শুধু ঘন কালো অন্ধকারেই ঢাকা থাকে। বায়ুমণ্ডল আর সমুদ্রের মধ্যে কিছু অণু প্রাক-উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তারাই আপতিত আলোর ফোটন কণাকে বাড়তি শক্তি জুগিয়ে বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে আকাশ আর সমুদ্রের নীল রঙ সৃষ্টি করে। এই হলো রমনের ব্যাখ্যা।

রমন ক্রিয়া সর্বঘটে কাঁটালি কলা। কার্যক্ষেত্রে এর ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক, আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিশ্লেষণের কাজে এর ব্যবহার বিস্তৃত। বিভিন্ন পদার্থের আণবিক প্রকৃতি আর স্ফটিক বিজ্ঞানে আন্তঃআণবিক বন্ধনী শক্তি নির্ণয়ে রমন ক্রিয়ার ভূমিকা অসাধারণ।

এছাড়া পরমাণু কেন্দ্রীয়ের আবর্তন আইসোটোপী ঘূর্ণন—এইসব অতি আধুনিক জটিল ব্যাপার স্যাপারেও রমনের কলেজী আবিষ্কারকে কাজে লাগান হচ্ছে। জৈব রসায়নে অবিশুদ্ধি নির্ধারণে কোনো যৌগে উপস্থিত মৌলিক পদার্থগুলোর অনুপাত নির্ণয়ে, এবং এ ধরনের বহু কাজে রমন ক্রিয়াকে কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য রমনের প্রতিভা শুধু তাঁর এই আবিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। শব্দ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন টান দেওয়া তারের কম্পনধর্ম—অর্থাৎ, দুপাশ থেকে টেনে বেঁধে রাখা তার বিভিন্ন অবস্থায় কোথায় আঘাত পেলে কীভাবে কাঁপবে, কাঁপার সময় তা থেকে কী ধরনের শব্দ তৈরি হবে—সে সম্বন্ধেও রমন বহু তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান গবেষণার ফসল রেখে গেছেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন, তবলা, সেতার ইত্যাদি—তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে ঢুকেছিল। শেষ জীবনে তিনি মানুষের শব্দগ্রাহী ইন্দ্রিয় কান নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।...

জাতীয় জীবনীকার

মণি বাগচি প্রণীত

জীবন চরিত মালা

জীবনীশতক	৩০৲
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	১২৲
বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র	১০৲
পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ভাবা	১০৲
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	১০৲
বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্লচন্দ্র	১০৲
কৃতী বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন	১০৲
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ	১০৲
পরমা প্রকৃতি সারদামণি	১০৲
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	১০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬ ১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৭৫

গ্রন্থ